অধ্যাপক গোলাম আযম

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন

অধ্যাপক গোলাম আযম

কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড

www.pathagar.com

পুনর্মুদ্রণ : অক্টোবর ২০০৮
প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ২০০৪

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন ❖ অধ্যাপক গোলাম আযম ❖ প্রকাশক : মুহাম্মদ হেলাল উদ্দীন, কামিয়াব প্রকাশন লিমিটেড, আজাদ সেন্টার, (৯ম তলা), ৫৫ পুরানা পল্টন, ঢাকা ১০০০ ❖ স্বত্ব © লেখক ❖ প্রচ্ছদ : মাসুম ❖ মুদ্রণ : পিএ প্রিন্টার্স, সূত্রাপুর, ঢাকা ১১০০।

বিক্রয়কেন্দ্র
৫১, ৫১/এ পুরানা পল্টন (নিচতলা), ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৯
দৈনিক সংগ্রাম গেইট, মগবাজার, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৭০৩০০৭
৩৪ নর্থ ব্রুকহল রোড, বাংলাবাজার, ঢাকা। ফোন ০৪৪৭৭৮০৩২১১

নির্ধারিত মূল্য : ত্রিশ টাকা মাত্র

www.pathagar.com

এ পুস্তিকার পটভূমি

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর থেকে শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশে এমন আজব ধরনের রাজনীতি চালু হয়েছে, যার প্রেক্ষিতে সংসদীয় গণতন্ত্র বিপন্ন হয়ে পড়েছে। নির্বাচিত সরকারকে গণ-অভ্যুত্থানের মাধ্যমে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন প্রকার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে।

আওয়ামী লীগ ও জনবিচ্ছিন্ন বামপন্থিরা নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতাসীন হবার ব্যাপারে সম্পূর্ণ হতাশ হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদী ও ইসলামী শক্তির ঐক্যকে তারা সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী উত্থান বলে আখ্যা দিয়ে ৪ দলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা-বিধ্বংসী হিসেবে ঘোষণা করেছে।

জোট সরকারকে অপসারণ করতে ব্যর্থ হয়ে তারা 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' রক্ষার জন্য সরাসরি ভারতকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছে। ভারতের পত্র-পত্রিকার প্রচারাভিযান তাদেরকে উৎসাহ যোগাচ্ছে এবং ভারতও তাদের এ তৎপরতায় উদ্বুদ্ধ হতে পারে।

এসব ঘটনা স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বে প্রশ্ন সৃষ্টি করেছে। তাদের তৎপরতা থেকে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তারা ইসলামী শক্তির উত্থানকে ঠেকাবার উদ্দেশ্যে বাংলাদেশে ভারতের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করা অপরিহার্য মনে করেন।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের অবদানকে পুঁজি করে তারা দেশের ভাগ্য নিয়ে ছিনিমিনি খেলার অধিকারী বলে মনে করতে পারেন; কিন্তু দেশের জনগণ ভারতের আধিপত্যের চরম বিরোধী।

তাই যারা বাংলাদেশের রাজনীতিতে ভারতের হস্তক্ষেপ করার আকাঙ্ক্ষী তাদেরকে জনগণ স্বাধীনতার পক্ষশক্তি বলে কিছুতেই স্বীকার করতে পারে না। তাদের হাতে আজ স্বাধীনতা বিপন্ন কিনা তা বিবেচনা করার জন্য এ পুস্তিকায় যথেষ্ট তথ্য পরিবেশন করা হয়েছে।

গোলাম আযম
৩০ ডিসেম্বর, ২০০৪

www.pathagar.com

'যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় তা'হলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নাই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালোবাসা ছিল না। আমি জানতাম, ভারতের প্রতি তাদের ভালোবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল; কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।'

ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'
(ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান)
স্টেটসম্যান, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮

www.pathagar.com

সূচিপত্র

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন ৭
১৯৯৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতি ৮
কী কী কারণে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলো? ৯
শেখ হাসিনার অপশাসন ১০
২০০১-এর নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার রাজনীতি ১৩
শেখ হাসিনা নিজের সঠিক মূল্যায়ন করুন ১৩
শেখ হাসিনার সর্বশেষ উপলব্ধি ১৪
শেখ হাসিনার ইসলামাতঙ্ক ১৫
বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র ১৫
আমেরিকায় শেখ হাসিনার অপপ্রচার ও আমেরিকার মনোভাব ১৬
প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট জিমি কার্টারের চিঠি ১৭
ভারতই শেখ হাসিনার শেষ ভরসা ১৮
২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার প্রতিক্রিয়া ২০
শেখ হাসিনার টারগেট অনেকটা হাসিল হয়েছে ২০
ভারতের বৈরী আচরণ ২৪
ভারতের আগ্রাসী নীতি ২৭
এদেশের সাথে ভারতের আচরণ ৩২
বাংলাদেশে কোথা থেকে হামলা আসতে পারে? ৩৩
কারা ভারতকে পরম বন্ধু মনে করে? ৩৪
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হুমকি ৩৪
সংসদে হিন্দুদের আসন সংরক্ষণের দাবি ৩৬
হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুমকি ৩৭
দত্তবাবুরাই কি বাঘ-সিংহ? সরকার ও দেশপ্রেমীরা কি ভীত মূষিক? ৩৮
আর একটি মুক্তিযুদ্ধের ডাক ৪৬
আর একটি মুক্তিযুদ্ধ কাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হবে? ৪৮
স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ ৪৮
বাংলাদেশে 'র'-এর সক্রিয় ভূমিকা ৪৯
উক্ত বইটির ভূমিকা হিসেবে লেখকের কথা ৫০
লে. (অব.) আবু রুশদের পরিবেশিত তথ্যাবলি ৫৩

www.pathagar.com

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী গঠন ৫৩
প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা ৫৪
'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন ৫৫
স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের প্রথম ব্লু প্রিন্ট ৫৬
ভারত সরকারকে মদদ দিতেই হবে ৫৬
সরকারের ভেতরে বাইরে বিভিন্ন স্তরে
৩০ হাজার 'র'-এর এজেন্ট তৎপর ৫৭
ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি ৫৮
'লজ্জা' ও তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি ৫৯
হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তৎপরতা ৬০
গোয়েন্দা সংস্থার যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে ৬১
মেজর জে. গোলাম কাদের ৬২
আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায় ৬৬
বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির খবর যেভাবে পত্রিকায় এসেছে ৬৭
আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনায় পার্থক্য ৬৯
জলিল সাহেবের বক্তব্যের তাৎপর্য ৬৯
ডেপুটি হাই কমিশনারের ধৃষ্টতা ৬৯
'৭১ সাল ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য ৬৯
মৈত্রী সমিতির আরো মারাত্মক আলোচনা ৭১
আওয়ামী লীগ ভারতের কোনো বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করে না ৭১

www.pathagar.com

স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন

স্বাধীনতা অর্জনের চেয়ে যথাযথভাবে রক্ষা করা কম কষ্টসাধ্য নয়। দখলদার বিদেশী শক্তির কবল থেকে দেশকে উদ্ধার করার আন্দোলনে জনগণের আবেগময় সাড়া পাওয়া যায়। বিদেশের দালালরা জনসাধারণের নিকট পাত্তা পায় না। কিন্তু একটি স্বাধীন দেশে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের মধ্যে দেশ গড়ার ব্যাপারে যদি বিপরীতমুখী চিন্তা ও আদর্শের দ্বন্দ্ব প্রকট হয়ে দেখা দেয়, তাহলে উভয় দিকের নেতৃত্বেরই যদি বিরাট জনসমর্থন থাকে এবং উভয় পক্ষই যদি রাজনৈতিক সমঝোতায় উপনীত হতে ব্যর্থ হয়, তাহলে গৃহযুদ্ধের আশঙ্কা প্রবল হয়ে ওঠে।

এ ধরনের পরিস্থিতিতে যদি প্রতিবেশী কোন দেশ কোন পক্ষ অবলম্বন করে তাহলে গৃহযুদ্ধ ভয়াবহ রূপ ধারণ করতে পারে। এমনকি স্বাধীনতাও বিপন্ন হতে পারে। সুদানের দক্ষিণাঞ্চলে খ্রিস্টানদের দ্বারা পরিচালিত বিদ্রোহে পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশ ইন্ধন যোগাচ্ছে বলে সুদান সরকারের সমঝোতার প্রচেষ্টা সফল হচ্ছে না। বৈরুতে ১০/১২ বছর খ্রিস্টান ও মুসলমানদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ চলা সত্ত্বেও পার্শ্ববর্তী কোন দেশ কোন পক্ষ অবলম্বন না করায় শেষ পর্যন্ত ক্লান্ত হয়ে উভয়পক্ষ গত দু'দশক পূর্বে আপসে মীমাংসায় পৌঁছতে বাধ্য হয়েছে। তাদের স্বাধীনতা বিপন্ন হয়নি।

বাংলাদেশে এমন কোন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে বা হচ্ছে কিনা এ বিষয়টা অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা করা অত্যন্ত জরুরি বলে আমার মনে হচ্ছে। ২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত সংসদ নির্বাচনের পর থেকে আওয়ামী লীগ যে আজব রাজনৈতিক ভূমিকা পালন করে চলেছে এবং প্রতিবেশী দেশটি থেকে আওয়ামী লীগ যে অনুকূল সাড়া পাচ্ছে তাতে সচেতন দেশবাসী স্বাভাবিকভাবেই চরম শঙ্কাবোধ করছে। এক শ্রেণীর পত্র-পত্রিকা আওয়ামী লীগের রাজনীতির পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে ভারতের পত্র-পত্রিকার বক্তব্য এমনভাবে পরিবেশন করছে, যা ঐ শঙ্কাকে তীব্রতর করে তুলেছে। তাই আওয়ামী লীগের চরম অগণতান্ত্রিক আচরণ ও ভারতীয় পত্রিকায় তাদের অনুকূল ভূমিকার বিশ্লেষণ করে দেশপ্রেমিক কলামিস্টগণ প্রচুর লেখালেখি করছেন।

রাজনৈতিক অঙ্গনে বর্তমানে আওয়ামী নেতৃত্বে যে চরম অস্থিরতা সৃষ্টি করা হয়েছে তাতে স্বাধীন বাংলাদেশের অস্তিত্বের প্রতি হুমকি প্রকট হয়ে উঠেছে। তাই আওয়ামী লীগ ও শেখ হাসিনার ভূমিকা যথাযথভাবে পর্যালোচনা করা কর্তব্য মনে করছি।

বিষয়টি শুধু রাজনৈতিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার ব্যাপার নয়; রাজনৈতিক ময়দানে প্রতিযোগিতা অস্বাভাবিক নয়। জামায়াতে ইসলামীর রাজনীতির বিরোধিতা করা ধর্মনিরপেক্ষতাবাদী আওয়ামী লীগের পক্ষে অবশ্যই স্বাভাবিক। কিন্তু আমরা সবাই যদি দেশপ্রেমিক হই তাহলে এমন কোন ভূমিকা পালন করতে পারি না, যার ফলে দেশের অস্তিত্বের প্রশ্ন সৃষ্টি হয়।

www.pathagar.com

১৯৯৬ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের রাজনীতি

শেখ হাসিনা ১৯৮১ সালের মে মাসে ইন্দিরা গান্ধীর আশ্রয় থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসার আগে ১৯৭৯ সালের দ্বিতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৩৯টি আসন পায়। শেখ মুজিব আমলের স্পিকার আঃ মালেক উকিল আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টারি পার্টির লীডার নির্বাচিত হন এবং জিয়াউর রহমানের আমলে সংসদে বিরোধী দলের নেতার দায়িত্ব পালন করেন। দলের নেতৃত্বের কোন্দল মেটাতে ব্যর্থ হয়ে ডঃ কামাল হোসেনের উদ্যোগে দিল্লি থেকে শেখ হাসিনাকে এনে দলীয় প্রধানের পদে বসিয়ে দলকে সংহত রাখার ব্যবস্থা করা হয়। নেতাদের ধারণা ছিলো যে, তাদের পরামর্শ অনুযায়ীই শেখ হাসিনা দলকে পরিচালনা করবেন। কিন্তু শেখ হাসিনা দলের গদি হাতে পেয়ে তার পিতার মতোই একনায়কের ভূমিকা পালন করায় ডঃ কামাল হোসেনকেও বিতাড়িত হতে হয়। এরশাদের স্বৈরশাসনামলে ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত তৃতীয় সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৫৭টি আসনে বিজয়ী হয় এবং শেখ হাসিনা বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নির্বাচনী ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করেননি। ১৯৯১ সালে প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় পঞ্চম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ৮৭ টি আসনে বিজয়ী হয়। শেখ হাসিনা ঐ নির্বাচনে সূক্ষ্ম কারচুপি হয়েছে বলে ক্ষীণ আপত্তি জানালেও নির্বাচনী ফলাফলকে মেনে নিয়ে সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

মাগুরা জেলার মুহাম্মদপুর আসন থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এমপি'র মৃত্যুতে শূন্য ঐ আসনটিতে ১৯৯৪ সালের এপ্রিল মাসে অনুষ্ঠিত উপনির্বাচনে বিএনপি সরকার আসনটি দখল করে নেয়। এর প্রতিবাদে আওয়ামী লীগ সিদ্ধান্ত নেয় যে, বিএনপি সরকারের পরিচালনায় আর কোন উপনির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না।

১৯৯১-এর নির্বাচনে বিএনপি জামায়াতে ইসলামীর সমর্থন নিয়ে সরকার গঠনের পরপরই জামায়াতে ইসলামী সংসদে পেশ করার উদ্দেশ্যে কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতি বিল জমা দেয়। ঐ বছরই আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি নিজ নিজ দলের পক্ষ থেকে অনুরূপ বিল জমা দেয়। বিএনপি কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচিত হওয়া সত্ত্বেও এ পদ্ধতিকে আইনে পরিণত করতে সম্মত হলে এ দাবিতে কোন আন্দোলনের সুযোগ বাকি থাকতো না। এ জনপ্রিয় ইস্যুটিকে নিয়ে আন্দোলন করার মহাসুযোগ পেয়ে আওয়ামী লীগ সরকার পতনের আন্দোলনের ডাক দেয়। এ আন্দোলনের পরিণামেই '৯৬ সালের মার্চ মাসে বিএনপি সরকার পদত্যাগ করতে বাধ্য হয়। '৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে একদলীয় প্রহসনমূলক ষষ্ঠ সংসদ নির্বাচনের পর বিএনপি কেয়ারটেকার সরকার আইন পাস করে মার্চে পদত্যাগ করে কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের সুযোগ করে দেয়।

সাবেক প্রধান বিচারপতি হাবিবুর রহমানের নেতৃত্বে গঠিত কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় ৭ম সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ না হলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হয় এবং জাতীয় পার্টির সমর্থনে ক্ষমতাসীন হয়। কেয়ারটেকার সরকার আন্দোলনের সুযোগ না পেলে নির্বাচনে আওয়ামী লীগের বিজয়ী হওয়ার কোন সম্ভাবনাই ছিলো না।

www.pathagar.com

কী কী কারণে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় গেলো?

১৯৭৯ সাল থেকে '৯১ সাল পর্যন্ত তিনটি সংসদ নির্বাচনে আওয়ামী লীগ ক্ষমতার ধারে কাছেও পৌঁছতে পারেনি। ১৯৯৬-এর জুনের নির্বাচনে কী কী কারণে এতোটা এগিয়ে গেলো তা উল্লেখ করা প্রয়োজনবোধ করি। নির্বাচনী অভিযানের এক পর্যায়ে শেখ হাসিনা নির্বাচনের পূর্বেই ওমরা করতে যান। ওমরার পোশাক মাথায় রেখেই হাতে তসবীহ নিয়ে তিনি ফিরে আসেন এবং এ অবস্থায়ই অবশিষ্ট নির্বাচনী অভিযান চালান। তিনি অত্যন্ত বিনীতভাবে জনগণের নিকট আওয়ামী লীগের অতীত ভুল-ভ্রান্তির জন্য করজোড়ে ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং অন্তত একটি বারের জন্য সেবা করার সুযোগ ভিক্ষা চান। গোটা নির্বাচনী অভিযানে একবারও তিনি তার পিতার হত্যার বিচার দাবি করেননি এবং ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ তার আদর্শ বলে ঘোষণা করেননি। তার প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে তার স্বভাবসুলভ আক্রমণাত্মক ভাষাও তেমন একটা প্রয়োগ করেননি।

জনগণ হয়তো ধারণা করেছে যে, এ আওয়ামী লীগ আগের মতো উগ্র নয়, মোটামুটি সংশোধন হয়ে গণতন্ত্রমনা হয়ে উঠেছে। ১৯৯৬ সালে যারা ভোটার ছিলো তাদের অধিকাংশই ২১ বছর আগের আওয়ামী কুশাসন ও দুর্নীতি, '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ, রক্ষীবাহিনীর নির্যাতন ও শেখ মুজিবের স্বৈরশাসন দেখেনি। '৯৪-এর এপ্রিল থেকে '৯৬-এর মার্চ পর্যন্ত আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে কেয়ারটেকার সরকার দাবিতে দীর্ঘ আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী শরীক থাকায় হয়তো জনগণের মধ্যে এমন ধারণাও সৃষ্টি হয়ে থাকতে পারে যে, আওয়ামী লীগ আগের মতো আর ইসলামবিরোধী হবে না। বিশেষ করে বিএনপি কেয়ারটেকার দাবি অগ্রাহ্য করায় এবং কোন রাজনৈতিক দল '৯৬-এর ফেব্রুয়ারিতে অনুষ্ঠিত প্রহসনের নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করায়, নির্বাচনের পর পদত্যাগ করতে বাধ্য হবার কারণে চরমভাবে মর্যাদা হারায়। বিএনপি-র বিকল্প রাজনৈতিক দল হিসেবে জনগণ হয়তো বাধ্য হয়েই আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছে। কারণ আর কোন দল বিকল্প হওয়ার মর্যাদায় গণ্য ছিল না।

উপরিউক্ত বহুবিধ অনুকূল পরিবেশ পাওয়া সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে বিজয়ী হতে পারেনি। দীর্ঘ ছয় বছর পর্যন্ত কারারুদ্ধ অবস্থায় পড়ে থাকা সাবেক স্বৈরশাসক এরশাদের জাতীয় পার্টির সেক্রেটারি জেনারেলকে মন্ত্রিত্ব দিয়ে এবং এরশাদকে কারামুক্তির লোভ দেখিয়ে ঐ দলের সমর্থন যোগাড় করে শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হন।

শেখ হাসিনার অপশাসন

১৯৯৬ সালের জুন মাস থেকে দীর্ঘ পাঁচ বছর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা তার পিতার মতোই দাপটের সাথে রাজত্ব করেন। জনগণের সেবা করার সুযোগ দেবার জন্য নির্বাচনের পূর্বে তিনি কাতরভাবে আবেদন জানিয়েছিলেন। কিন্তু ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তিনি আসল মূর্তিতে আবির্ভূত হন। নির্বাচনী ম্যানিফেস্টো অনুযায়ী দেশগড়া ও জনসেবার দায়িত্ব কতটুকু তিনি পালন করেছেন তা আমার জানার সৌভাগ্য হয়নি। ম্যানিফেস্টোতে উল্লেখ নেই এমন বিরাট বিরাট কতক কর্মসম্পাদনের উপর তিনি সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। যা তার শাসনামলের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য কীর্তি :

www.pathagar.com

১. তার পিতাকে জাতির পিতা হিসেবে মেনে নিতে জনগণকে বাধ্য করার অপচেষ্টা। শেখ মুজিব এককালে নিঃসন্দেহে জনগণের প্রাণপ্রিয় নেতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। কিন্তু তার সাড়ে তিন বছরের শাসনামলে তার জনপ্রিয়তা শূন্যেরও নিচে চলে যায়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শেখ মুজিব সপরিবারে নির্মমভাবে নিহত হওয়া সত্ত্বেও জনগণ চরম উল্লাস প্রকাশ করেছে। পিতার মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকলে কি এমন আচরণ প্রকাশ পেতে পারে?

শেখ মুজিবের ফটো সরকারি ও বেসরকারি সকল প্রতিষ্ঠান, এমনকি মাদরাসায়ও স্থাপন করার জন্য আইন পাস করা হয়, যাতে জাতির পিতা হিসেবে তাঁকে সম্মান দেখাতে সবাই বাধ্য হয়। সম্মান কখনো আইনের জোরে আদায় করা যায় না। এটা আবেগের ব্যাপার। শেখ হাসিনা তার পিতার জন্য স্বাভাবিক কারণেই যে আবেগ অনুভব করেন তা আইনের ঊর্ধ্বে। এ আবেগ জনগণের মধ্যে আইনের দ্বারা সৃষ্টি করা যায় না।

২. শেখ মুজিবের শ্বাসরুদ্ধকর স্বৈরশাসনের কবল থেকে দেশ ও জনগণকে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে উদ্ধার করে জাতিকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করলেন, তাদেরকে সাধারণ খুনের আসামি হিসেবে ফাঁসিতে ঝুলানোর অপচেষ্টা। শেখ হাসিনা ২য়, ৪র্থ ও ৫ম সংসদে বিরোধী দলীয় নেতা ছিলেন। ১৯৮১ সালের মে মাসে দেশে আসলেন। ১৫ বছর পর্যন্ত তিনি তার পিতার হত্যার বিচার দাবি করলেন না। ৭ম সংসদের নির্বাচন অভিযানে এ বিষয়ে ইঙ্গিতও দেননি। '৯৬-এর জুনে ক্ষমতাসীন হয়ে সর্বশক্তি প্রয়োগ করলেন। মুজিব হত্যার বিচারের উদ্দেশ্যে জেলের সংলগ্ন স্থানে এক বিশেষ আদালত কায়েম করা হয়। ঐ আদালত ১৫ জন সেনা-কর্মকর্তাকে ফায়ারিং স্কোয়াডে গুলি করে হত্যার নির্দেশ দেয়। এ রায়ের বিরুদ্ধে হাই কোর্টে আপিল করা হলে বার বার বেঞ্চ বদল করতে হয়। কারণ বেঞ্চের কোন বিচারপতি এ মামলার শুনানি করতে বিব্রতবোধ করলে বেঞ্চ পরিবর্তন করা জরুরি হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত হাই কোর্ট ১৫ জনের মধ্যে ১৩ জনের মৃত্যুদণ্ডাদেশ বহাল রাখে। এ রায়ের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টের আপিল বিভাগে আবেদন জানানো হলে সেখানেও কোন কোন বিচারপতি বিব্রতবোধ করেন। ২০০০ সালের ডিসেম্বরের মধ্যে মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করার হুমকি দিয়ে স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর নেতৃত্বে জঙ্গি লাঠিমিছিল করা হয় এবং বিচারপতিদের উপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হয়। ঐ মামলা এখনো সুপ্রিম কোর্টেই ঝুলন্ত অবস্থায় আছে।

মুজিব হত্যার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে ১০ জনেরও একটি প্রতিবাদ বা বিক্ষোভ মিছিল বের হলো না। আওয়ামী লীগই ক্ষমতাসীন থাকলো। শেখ মুজিবের আমলের সংসদ সদস্যরাই বহাল রইলেন। শেখের মন্ত্রিসভার এক সিনিয়র মন্ত্রী দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন, ঐ মন্ত্রিসভার সদস্যগণই নতুন মন্ত্রিসভায় যোগ দিলেন। অথচ আগস্ট-বিপ্লবের নায়ক সেনা-কর্মকর্তারাই শুধু ফাঁসির আসামী হলেন। ১ম সংসদের স্পিকার মালেক উকিল লন্ডনে গিয়ে ফিরাউনের পতন হয়েছে বলে ঘোষণা দেওয়া সত্ত্বেও তিনিই '৮১ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের সভাপতির পদে বহাল রইলেন। মুজিব হত্যা যদি সত্যিই অপরাধ হয়ে থাকে তাহলে মুজিব হত্যার প্রতিবাদ না করার অপরাধে শেখ হাসিনা ছাড়া আওয়ামী লীগের বর্তমান সকল নেতা-নেত্রীরই বিচার হওয়া উচিত।

সর্বোপরি তথাকথিত 'জাতির পিতা'র হত্যায় বিক্ষুব্ধ না হয়ে গোটা দেশবাসী উল্লাস প্রকাশ করে এবং শোক প্রকাশ না করে যে মহা-অপরাধ করেছে তাদেরও বিচার করার উদ্যোগ নেওয়া অবশ্যই প্রয়োজন ছিলো।

আমার আশঙ্কা হয় যে, গণতন্ত্রের চরম দুশমন ও স্বৈরাচারীকে হত্যা করে জনগণকে যারা রাজনৈতিক অধিকার ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করলেন তাদেরকে ফাঁসি দেবার অপচেষ্টা করলে জনগণ তা কোনভাবেই মেনে নেবে না।

৩. শাসনতন্ত্র থেকে ভারতীয় রাজনৈতিক মতাদর্শ তথাকথিত "ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ" ১৯৭৭ সালে গণভোটের মাধ্যমে উৎখাত হওয়া সত্ত্বেও প্রধানমন্ত্রীর পদে অধিষ্ঠিত থাকা অবস্থায় ঐ বিদেশী মতবাদকে তার দলের আদর্শ বলে দাপটের সাথে ঘোষণা করলেন। সরকারি সর্বোচ্চ পদের অধিকারী ব্যক্তি কেমন করে এমন অসাংবিধানিক ঘোষণা দিতে পারলেন। অথচ প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেবার সময় তিনি সংবিধানের আনুগত্য ও সংরক্ষণের অঙ্গীকার করেছেন। সংবিধান সংশোধনের যে পদ্ধতি সংবিধানে রয়েছে, সে অনুযায়ী তিনি সংবিধানে তার ঐ আদর্শকে পুনর্বহাল করার চেষ্টা করা দূষণীয় বলে গণ্য হতো না। কিন্তু সংবিধানকে অস্বীকার করার কোন আইনগত ক্ষমতা বা অধিকার তার ছিলো না।

ঐ আদর্শকে শক্তিবলে কায়েম করার ষড়যন্ত্র হিসেবেই তিনি সকল ইসলামী দল ও মাদরাসা শিক্ষাকে উৎখাত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। যখনই কোথাও বোমা বিস্ফোরণে নিরপরাধ মানুষ নিহত হয়েছে তখনই তিনি 'মৌলবাদী'দেরকে দায়ী বলে ঘোষণা করেছেন। তাদের মতে, ইসলামী দল ও মাদরাসাই মৌলবাদীদের আখড়া। বোমা বিস্ফোরণের কোন ঘটনারই তিনি তদন্ত করেননি। কারণ তিনি নিশ্চিতভাবেই জানেন যে, কারা অপরাধী। এভাবে দেশের ইসলামী শক্তিকে দাবিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে নির্যাতনের পথ বেছে নেন। কারণ তাদেরকে দমন করতে না পারলে ধর্ম-নিরপেক্ষ মতবাদ দেশে চালু করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

৪. শেখ মুজিব রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মাধ্যমে তার স্বৈরশাসনকে চিরস্থায়ী করার উদ্দেশ্যে রক্ষীবাহিনী গঠন করেছিলেন। শেখ হাসিনাও একই মহান উদ্দেশ্যে জেলায় জেলায় দলীয় গড়-ফাদারদের তত্ত্বাবধানে সশস্ত্র ক্যাডার বাহিনী গড়ে তোলেন। নানা অজুহাতে বড় বড় কয়েকজন আলেমকে খুনি সাব্যস্ত করে গ্রেপ্তার করা হয়। সারা দেশে আলেম সমাজে ত্রাসের সঞ্চার হয়।

৫. বাংলাদেশকে পৈতৃক সম্পত্তি হিসেবে ব্যাপক দখলি প্রচেষ্টা। যেসব স্থাপনা, প্রতিষ্ঠান ও সংস্থা গুরুত্বপূর্ণ সেসবের নামের সাথে 'বঙ্গবন্ধু' যুক্ত করা হয়। স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, পেশাজীবী সমিতি, হাটবাজার, ঘাট, বীমা, ব্যাংক, সরকারি খাস জমি ও বস্তি এলাকা দলীয় লোকদের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। শেখ

www.pathagar.com

হাসিনা প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে মানের বিশেষ নিরাপত্তা ভোগ করেছেন, অনুরূপ ব্যবস্থা আজীবন তার ও তার বোনের জন্য নিশ্চিত করার উদ্দেশ্যে আইন রচনা করা হয়। সবচেয়ে বিস্ময়ের বিষয় হলো যে, শেখ হাসিনার মন্ত্রিসভা প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন হিসেবে ব্যবহৃত 'গণভবন'কে শেখ হাসিনার স্থায়ী বাসভবন হিসেবে বরাদ্দ করে দেয়। শেখ হাসিনা সন্তুষ্টচিত্তে ঘোষণা করেন যে, তিনি যত দিন রাজনীতি করবেন ততদিন তিনি গণভবনেই থাকবেন। এমন নির্লজ্জ সিদ্ধান্ত নেবার কোন নযীর কোথাও আছে কিনা আমার জানা নেই। বাংলাদেশটাকে তিনি মৌরুসী সম্পত্তি মনে না করলে এমন আজব সিদ্ধান্ত নিতে পারতেন না।

৬. দেশবাসীর মধ্যে ঐক্য গড়ার বিপরীতে বিভেদ সৃষ্টি করার ধ্বংসাত্মক নীতি গ্রহণ। দেশপ্রেমিক নেতারা রাজনৈতিক বিরোধীদেরকেও আপন করে নেবার নীতি প্রয়োগ করে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে দেশ গড়ার কাজে লাগাবার চেষ্টা করেন। দক্ষিণ আফ্রিকার দখলদার শ্বেতাঙ্গরা কালোদেরকে গোলাম বানিয়ে রাখার হীন উদ্দেশ্যে তাদের নেতা ড. নেলসন ম্যান্ডেলাকে ২৯ বছর কারাবন্দি করে রাখা সত্ত্বেও কারামুক্ত হবার পর তিনি শ্বেতাঙ্গদের সাথে হাত মিলিয়ে দেশ গড়ার মহান লক্ষ্যে সফলতা লাভ করেন। যদি তিনি প্রতিশোধ নেবার মানসিকতা পোষণ করতেন, তাহলে দেশে বিভেদ ও বিশৃঙ্খলাই চালু থাকতো, রাষ্ট্রনায়ক হিসেবে তিনি ব্যর্থ হতেন। শেখ হাসিনা এর বিপরীত নীতিই গ্রহণ করলেন। স্বাধীনতার পক্ষ ও বিপক্ষের ধুয়া তুলে তিনি ইসলামী শক্তিকে ঘায়েল করার অপচেষ্টা চালান। এ ভেদনীতি তার জন্য নির্বাচনে বুমেরাং হয়েই দেখা দেয়।

৭. শেখ হাসিনা সকল গণতান্ত্রিক নীতি ও ঐতিহ্য ধ্বংস করার মাধ্যমে তার ক্ষমতার দাপট দেখিয়ে গর্ববোধ করতেন। রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে দমন করার জন্য চরম হিংস্র আচরণ করতেও তিনি দ্বিধাবোধ করতেন না। তার ঘনিষ্ঠ সেবক মতিউর রহমান রেন্টুর 'আমার ফাঁসি চাই' বইটিতে এর চমকপ্রদ বিবরণ রয়েছে। আমি শুধু একটা উদাহরণকেই যথেষ্ট মনে করি। শেখ হাসিনার আমল ছাড়া এর পূর্বে ও পরে কোন আমলেই বিরোধী দলের হরতাল বানচাল করার উদ্দেশ্যে সরকারি পক্ষ থেকে সশস্ত্র জঙ্গি মিছিল করতে দেখা যায়নি।

তার মুখে কখনো গণতান্ত্রিক ভাষা শুনতে পাওয়া যায় না। কোন রাজনৈতিক নেতা এতো অশালীন ভাষায় কথা বলেন না। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে চট্টগ্রাম লালদীঘির ময়দানে অনুষ্ঠিত জনসভায় তার দলের লোকদেরকে তিনি নির্দেশ দিলেন যে, প্রতিপক্ষের ফেলা একটি লাশের বদলে ১০টি লাশ ফেলতে হবে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতার দাবি হলো, শাসন বিভাগের পক্ষ থেকে আদালতের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষা করা। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা বার বার সর্বোচ্চ আদালতের প্রতি কটাক্ষ করে বক্তব্য রেখেছেন। সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অত্যন্ত শালীন ভাষায় একাধিকবার তাঁকে সতর্ক করা সত্ত্বেও তিনি নিজেকে সংশোধন করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠানের বিধান না থাকলে শেখ হাসিনার কু-শাসন দেশের উপর কতকাল চেপে থাকতো তা আল্লাহই জানেন। সর্বদিক দিয়ে তার পিতাই তার শ্রেষ্ঠ আদর্শ নেতা। তাই তার পিতার মতোই তিনি স্বৈরশাসন চালু করার চেষ্টা করেন।

২০০১-এর নির্বাচনের পর শেখ হাসিনার রাজনীতি

২০০১ সালের ১ অক্টোবরে অনুষ্ঠিত অষ্টম সংসদ নির্বাচনের দিন শেখ হাসিনা সাংবাদিকদের নিকট সন্তোষ প্রকাশ করে বলেছেন যে, নির্বাচন সুষ্ঠু হয়েছে। কিন্তু নির্বাচনী ফলাফল প্রকাশ পাওয়ার সাথে সাথেই তিনি ফলাফলকে প্রত্যাখ্যান করে 'স্থূল কারচুপি' হয়েছে বলে অভিযোগ করেন। নির্বাচিত সদস্য হিসেবে তিনি শপথ নেবেন না বলে ঘোষণা করেন। বিলম্বে হলেও শেষ পর্যন্ত শপথ নেন বটে, কিন্তু এক বছর পর্যন্ত তার দলীয় সদস্যদেরকে সংসদে যেতে দেননি।

শেখ হাসিনা নির্বাচনে তার দলকে পরাজিত করার জন্য পরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করা হয়েছে বলে দাবি করেন। তিনি প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ, কেয়ারটেকার সরকার-প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান, প্রধান নির্বাচন কমিশনার এম এ সাঈদ, সেনাপ্রধান ও পুলিশপ্রধানকে ষড়যন্ত্রের জন্য দায়ী করেন। তার স্বভাবসুলভ অত্যন্ত অশালীন ভাষায় কয়েকবার প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে বক্তব্য দেবার পর অতিষ্ঠ হয়ে প্রেসিডেন্ট অতীব শালীন ভাষায় বলিষ্ঠ প্রতিবাদ জানান।

তিনি প্রেসিডেন্টকে নির্বাচন বাতিল করে পুনর্নির্বাচন দাবি করেন। ২০০২ সাল থেকেই তিনি জোট সরকারের পদত্যাগ দাবি করে আসছেন। ২০০৪ সালের মার্চ মাসে তার দলের পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক ঘোষণা করলেন যে, ৩০ এপ্রিলের মধ্যে বেগম জিয়া পদত্যাগ করতে বাধ্য হবেন। গত ৩ অক্টোবর (২০০৪) পল্টন ময়দানের মহাসমাবেশে তিনি বেগম জিয়াকে পদত্যাগ করে নতুন নির্বাচন দেবার দাবি জানান।

প্রশ্ন হলো, আবার নির্বাচন হলেই তার দলের ক্ষমতাসীন হবার নিশ্চয়তা কে দেবে? যদি তিনি বিজয়ী হতে না পারেন তাহলে আবার তিনি নির্বাচনী ফলাফল প্রত্যাখ্যান করবেন। তাঁকে বিজয়ী করার যোগ্য প্রেসিডেন্ট, কেয়ারটেকার সরকার প্রধান, নির্বাচন কমিশন প্রধান, সেনা ও পুলিশ প্রধান তিনি কেমন করে যোগাড় করবেন? সুতরাং নতুন করে নির্বাচনে কেমন করে তার বিজয় নিশ্চিত হবে?

শেখ হাসিনা নিজের সঠিক মূল্যায়ন করুন

বিগত নির্বাচনে শেখ হাসিনার এমন শোচনীয় পরাজয় কেন ঘটলো তা তিনি মোটেই উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। কেয়ারটেকার সরকার পদ্ধতিতে অনুষ্ঠিত উক্ত নির্বাচন সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ, অবাধ ও সুষ্ঠু হয়েছে বলে দেশী ও বিদেশী সকল নির্বাচন পর্যবেক্ষক মযবুত সার্টিফিকেট দিয়েছেন। তারাও যদি সবাই শেখ হাসিনার দুশমন হয়ে থাকেন তাহলে তিনি আর কোথায় আশ্রয় পাবেন? ব্যালট ডাকাতি করে চার-দলীয় জোট বিজয়ী হয়েছে বলে একমাত্র শেখ হাসিনাই বার বার হাস্যকর ঘোষণা দিচ্ছেন। আর কোন মহল এমন নির্লজ্জ মিথ্যা উচ্চারণ করেনি।

www.pathagar.com

শেখ হাসিনা বার বার দাবি করছেন যে, তার ৫ বছরের শাসন আমল এ দেশের স্বর্ণযুগ ছিলো। কোন সন্ত্রাস ছিলো না। মানুষ নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পেরেছে। দেশ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো এবং দেশবাসী অত্যন্ত সুখে-শান্তিতে জীবনযাপন করেছে। এভাবেই তিনি নিজের ঢোল নিজেই জোরে জোরে পিটাচ্ছেন। আর কেউ যখন পিটায় না, তখন আর উপায় কী? তার আমলের ৭ দফা কু-কীর্তির কারণেই যে জনগণ তাঁকে নির্বাচনে প্রত্যাখ্যান করেছে, সেকথা উপলব্ধি করার যোগ্যতাও তিনি হারিয়েছেন। এতে প্রমাণিত হয় যে, তার চরিত্রের সংশোধনেরও কোন সম্ভাবনা নেই। তার বিষাক্ত ও শাণিত জিহ্বাই যে তার বড় আপদ ও শত্রু, সে কথা বুঝতে চেষ্টা করলে তারই কল্যাণ হতে পারে।

আমার সুচিন্তিত অভিমত, চার-দলীয় জোট শুধু তাদের ইতিবাচক গুণাবলির কারণে এতো বড় বিজয় লাভ করেনি। শেখ হাসিনার চরম ইসলাম বিরোধী, স্বৈরাচারী ও সন্ত্রাসী শাসন থেকে জান বাঁচাবার প্রচণ্ড তাগিদেই জনগণ জোটের আশ্রয় গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছে।

শেখ হাসিনার সর্বশেষ উপলব্ধি

শেখ হাসিনার নির্বাচনোত্তর আচরণ পর্যালোচনা করে আমি এ সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি যে, তিনি জনগণ, নির্বাচন ও গণতন্ত্রের প্রতি সম্পূর্ণরূপে আস্থা হারিয়েছেন। গণতন্ত্রে বিশ্বাস থাকলে তিনি নির্বাচনের পর সংসদে গণতন্ত্রের ঐতিহ্য অনুযায়ী বিরোধী দলের সংসদীয় ভূমিকা পালন করতেন। তিনি এতো অল্প সংখ্যক আসনে বিজয়ী হওয়ায় নির্বাচনী ফলাফল কিছুতেই মেনে নিতে পারেননি। হয়তো তিনি ধারণাই করতে পারেননি যে, এতো কম আসন পাবেন। ৫ বছর ক্ষমতায় থেকে তিনি ৭ দফা কু-কীর্তির মাধ্যমে যা কিছু করতে চেয়েছিলেন তা সম্পন্ন করার প্রয়োজনে তার ক্ষমতাসীন হওয়া অপরিহার্য ছিলো। তাই কেয়ারটেকার সরকার কায়েমের পূর্বে ক্ষমতায় থাকাকালে তিনি নির্বাচনে বিজয়ের নীল নকশা তৈরি করেছিলেন। সচিবালয়, প্রশাসন ও পুলিশ বিভাগকে তিনি এ উদ্দেশ্যে সাজিয়ে রেখে এ ধারণায় ছিলেন যে, কেয়ারটেকার সরকার তার সাজানো সেটআপ অনুযায়ীই নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে বাধ্য। কিন্তু কেয়ারটেকার সরকার-প্রধানের দায়িত্ব গ্রহণ করার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তিনি সচিবালয়ে বিরাট রদবদল করেন। শেখ হাসিনা এর প্রতিবাদ করে এ পদক্ষেপকে 'সিভিল ক্যু' নামে অভিহিত করেন। তার এ বিশেষ অনুগত সচিবগণ প্রেসিডেন্ট বিচারপতি শাহাবুদ্দীনের নিকট আপত্তি উত্থাপন করলে সংবিধান অনুযায়ী নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচন অনুষ্ঠানের দায়িত্ব পালনের প্রয়োজনে কেয়ারটেকার সরকার নির্বাচিত সরকারের মতোই ক্ষমতা প্রয়োগের বৈধ অধিকারী বলে স্পষ্ট ভাষায় জানিয়ে দেন।

এর পরও শেখ হাসিনা কেয়ারটেকার সরকার-প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমানের পদক্ষেপসমূহের মধ্যে যেটাই তার মনমতো নয়, এর তীব্র প্রতিবাদ করেছেন। বিচারপতি তার ঐসব প্রগলভতার কোন জওয়াব দেবারও প্রয়োজনবোধ করেননি। তিনি নীরবে তার কর্তব্য পালন করতে থাকেন।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ও জনগণের রায়ের প্রতি যদি তার আস্থা থাকতো তাহলে জোট সরকারের বিরুদ্ধে তার সকল অভিযোগ নিয়ে দেশবাসীর দারস্থ হতেন। বিদেশে যেয়ে সরকারের বিরুদ্ধে প্রচারাভিযান চালাতেন না। জনগণকে সংগঠিত করে পরবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার আশা তিনি করেন না। বিদেশী শক্তি জোট সরকারকে উৎখাত করে তাঁকে গদিনশীন করে দিক–এমন আজব উদ্দেশ্য ছাড়া বিদেশে কেন অপপ্রচার চালাবেন? কোন গণতান্ত্রিক দেশের বিরোধী দল এমন উদ্ভট আচরণ করে বলে কোন নযীর নেই। ভারতে বাজপেয়ী সরকারের আমলে গুজরাটে মুসলিম গণহত্যার প্রতিবাদ করে সরকারকে বেকায়দায় ফেলার উদ্দেশ্যে বিরোধী দলের নেত্রী সোনিয়া গান্ধী হাসিনার মতো ভূমিকা পালন করতে বিদেশে যাননি।

শেখ হাসিনার ইসলামাতঙ্ক

শেখ হাসিনা তার শাসনামলে এমন যোগ্যতার সাথে প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছেন যে, তিনি কট্টর ধর্মনিরপেক্ষবাদী ও ভারতপন্থি এবং যারা বাংলাদেশে আল্লাহর আইন, ইসলামী খিলাফত ও শাসনতন্ত্র কায়েম করতে চায়, তাদেরকে তিনি উগ্র মৌলবাদী, সাম্প্রদায়িক ও ধর্মান্ধ বলে ঘৃণা করেন। তিনি আবার ক্ষমতায় বসতে পারলে সংবিধানে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে আদর্শ হিসেবে বহাল করবেন এবং ইসলামকে যারা নিছক একটা ধর্ম বলে বিশ্বাস করে তারা ছাড়া আর সব ইসলামপন্থিদেরকে তিনি নির্মূল করার চেষ্টা করবেন। তার পিতার আমলে প্রণীত সংবিধানে যেমন ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল গঠন বেআইনী করা হয়েছিলো, তিনি আবার তা-ই করবেন। যারা ইসলামকে পূর্ণাঙ্গ জীবন-বিধান বলে বিশ্বাস করে এবং রাজনীতি ও অর্থনীতিসহ সমাজ জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন, আল্লাহর রাসূল (স) ও খোলাফায়ে রাশেদীনের আদর্শ কায়েম করতে চায়, তাদেরকে তিনি তার প্রধান দুশমন মনে করেন।

তার আচরণের কারণে তার সম্পর্কে দেশবাসীর উপরিউক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার ফলেই গত নির্বাচনে কোন ইসলামপন্থি ভোটারই আওয়ামী লীগকে ভোট দেয়নি। আওয়ামী ওলামা লীগ গঠন করতে এ কারণেই তিনি ব্যর্থ হয়েছেন। জনগণের নিকট আলেম হিসেবে স্বীকৃত কোন আলেমই আওয়ামী লীগের সমর্থক নন। ইসলামকে শুধু কতক ধর্মীয় অনুষ্ঠান সর্বস্ব বলে বিশ্বাস করে, এমন আলেমরা তো রাজনীতি করাকেই হারাম মনে করেন। তারাও হয়তো আওয়ামী লীগকে সমর্থন করেন না।

বাংলাদেশকে তালেবান রাষ্ট্র আখ্যা দেবার ষড়যন্ত্র

শেখ হাসিনার বিগত তিন বছরের (২০০১-এর অক্টোবর থেকে ২০০৪-এর অক্টোবর) আচরণ থেকে সুস্পষ্ট হয়েছে যে, দেশে যে ইসলামী শক্তি রয়েছে তা আর কোন দিন আওয়ামী লীগকে ভোট দেবে না, জনগণের মধ্যে যারা ভারতকে বন্ধুরাষ্ট্র মনে করে না, তারাও শেখ হাসিনা ক্ষমতাসীন হোক তা চাবে না। এ অবস্থায় নির্বাচনের মাধ্যমে তার ক্ষমতা লাভের কোন সম্ভাবনা হয়তো নেই। তাই তিনি বাংলাদেশকে আফগানিস্তানের মতো মৌলবাদী ও তালেবান রাষ্ট্র হিসেবে প্রচারণা চালিয়ে বিদেশী

www.pathagar.com

শক্তিকে বাংলাদেশে অভিযান চালাবার জন্য উসকে দিচ্ছেন। হয়তো তিনি আশা করেন যে, বিদেশী শক্তি জোট সরকারকে উৎখাত করে তাঁকে আফগানিস্তানের কারজাইর মতো ক্ষমতায় বসিয়ে দেবে।

আমেরিকায় শেখ হাসিনার অপপ্রচার ও আমেরিকার মনোভাব

২০০১ সালের অক্টোবরে জোট সরকার কায়েম হবার পরপরই তিনি আমেরিকা সফরে যান। আফগানিস্তানে আমেরিকার ভূমিকায় আশান্বিত হয়েই হয়তো তিনি সর্বপ্রথম যুক্তরাষ্ট্রে যান। তিনি জোট সরকারের বিরুদ্ধে দুটো মারাত্মক অপবাদ ব্যাপকভাবে প্রচার করেন।

১. চারদলীয় জোটের দুটো দলই 'মৌলবাদী'। তাই জোট সরকার অবশ্যই তালেবানী। যে কারণে আফগানিস্তানের তালেবান সরকারকে উৎখাত করা জরুরি ছিলো, একই কারণে বাংলাদেশেও জোট সরকারকে উচ্ছেদ করা অপরিহার্য।

২. শেখ হাসিনার মতে, ইসলামপন্থি সবাই সন্ত্রাসী ও সাম্প্রদায়িক। তাই তারা বাংলাদেশের হিন্দুদের উপর নির্যাতন চালায়, হিন্দুদের সম্পত্তি দখল করে এবং হিন্দু মহিলাদেরকে ধর্ষণ করে। আর বিএনপি এসব কুকর্মে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা করে। সুতরাং জোট সরকারকে উৎখাত করা অত্যন্ত জরুরি।

আমেরিকা ও ইউরোপ এসব অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়নি। কারণ এসব দেশের রাষ্ট্রদূতগণ বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কোন সত্যতা খুঁজে পায় না। আমেরিকার সরকারি দায়িত্বশীলগণও বাংলাদেশ সফর করে এ দেশকে উদার মুসলিম রাষ্ট্র বলে মন্তব্য করেছেন এবং এ দেশে বিরাজমান সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির প্রশংসা করেছেন।

শেখ হাসিনার শাসনামলে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ক্লিনটন বাংলাদেশ সফরে এলে তথ্য মন্ত্রণালয় থেকে এ দেশে মৌলবাদীদের উত্থান সম্পর্কে পুস্তিকাকারে ভয়াবহ চিত্র তুলে ধরা সত্ত্বেও ক্লিনটন বিভ্রান্ত হননি। তার রাষ্ট্রদূত থেকে সঠিক তথ্য পেয়ে বাংলাদেশের প্রশংসাই করে গেছেন। ২০০১ সালে কেয়ারটেকার সরকার কায়েম হলে আমেরিকার সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার বাংলাদেশে এসে প্রধান দু'দলের নেত্রীদ্বয়ের সাথে একান্তে বাংলাদেশে গণতন্ত্রের বিকাশ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। তারা দু'জনেই তার নিকট কথা দেন যে, তারা নির্বাচনের ফলাফল মেনে নিবেন এবং যে দলই সরকার গঠন করুক, বিরোধী দল হিসেবে যথাযথ ভূমিকা পালন করবেন। তারা উভয়েই হরতাল ও ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপ করবেন না বলে তাঁকে আশ্বস্ত করেন।

অবশ্য এটা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় যে, গণতন্ত্রে বিশ্বাসী বলে দাবিদার এ দেশের দুটো প্রধান রাজনৈতিক দলের প্রধানকে অন্য দেশের এক নেতাকে এসে উপদেশ দিতে হয় এবং তাদের নিকট থেকে গণতান্ত্রিক আচরণের অঙ্গীকার নিতে হয়। তারা উভয়েই সন্তুষ্টচিত্তে রাজনৈতিক মুরুব্বি হিসেবে জিমি কার্টারকে গ্রহণ করেছেন বলেই না তিনি এ ভূমিকা পালনের সুযোগ পেয়েছেন। জিমি কার্টার বাংলাদেশকে ভালোবাসেন মনে করেই হয়তো দু' নেত্রী তাঁকে এ সুযোগ দিয়ে থাকবেন। জিমি কার্টারের ভূমিকা আন্তরিক বলেই মনে হয়। তা-না হলে তিনি এভাবে বাংলাদেশে আসবেন কেন? তিনি

www.pathagar.com

কেয়ারটেকার পদ্ধতিরও প্রশংসা করেন এবং তৃতীয় বিশ্বে গণতন্ত্রের বিকাশের জন্য উপযোগী বলে মন্তব্য করেন। তিনি ফিরে যাবার সময় নির্বাচনের দিন পর্যবেক্ষণের উদ্দেশ্যে আবার আসবেন বলে ঘোষণা করেও ১১ সেপ্টেম্বরে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পর সৃষ্ট পরিস্থিতির কারণে শেষ পর্যন্ত আসতে পারেননি।

প্রধান নির্বাচন কমিশনারের নিকট জিমি কার্টারের চিঠি

বিচারপতি লতিফুর রহমান তার রচিত "তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দিনগুলো ও আমার কথা" নামক ৩৪৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থের শেষে দু'পৃষ্ঠায় তিনি জিমি কার্টারের লেখা চিঠি হুবহু উদ্ধৃত করেছেন। তিনি নির্বাচন অনুষ্ঠানের তিন দিন পরই প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এম এ সাঈদকে চিঠি লিখেন। এ চিঠি আমিও উদ্ধৃত করার লোভ সামলাতে পারলাম না।

October 4, 2001

To M.A. Sayed

I am writing to congratulate you for the central role played by you and the Election Commission in ensuring the peaceful, free and fair conduct of the elections October 1. When I visited Bangladesh in August, I was impressed with the evenhanded, impartial preparations for the election being made by the caretaker government and the electoral authorities, laying the foundation for free and fair election. It now appears from all international and domestic observer reports that the elections were relatively peaceful and that they were conducted in accordance with international standards. These reports run counter to public statements attributed to Sheikh Hasina and the Awami League of massive rigging. Any complaints should follow normal legal channels of appeal rather than a complete refusal to recognize the election's legitimacy.

Given the international situation right now, it would be damaging and destabilizing for Bangladesh to enter into a protracted post-electoral political crisis. The candidates and their parties have the power to avoid such a crisis by adhering to the commitments they made in August. They agreed to renounce the use of *hartals*, violence and intimidation. Living up to this commitment will require clear, public statements to supporters to avoid mass demonstrations, strikes, and violent acts of any kind.

Party leaders, including former Prime Minister Sheikh Hasina, also pledged not to boycott the next Parliament and to help ensure that the opposition plays a meaningful role in the new legislature, no matter which party formed the government. I have called on Khaleda Zia to

respect fully the pre-electoral agreements to ensure a full and legitimate role for the opposition under the new government, especially in Parliament and with respect to the role of the Speaker, I urge other leaders to do the same. However, Sheikh Hasina's recent vow to boycott Parliament runs counter to her August pledge and has the potential not only to destablize this new Parliament, but also unravel the delicate fabrics of the Bangladeshi democracy.

As you know, I lost a presidential election myself. I am well aware of how hard it is to accept such a defeat. It is imperative, however, that the Awami League accept the results of the election in order to strengthen Bangladesh's democratic institutions in the long-term. The party has played an important leadership role for democracy in Bangladesh, and this is a role that must continue in opposition. This is the essence of democracy.

Bangladesh has many friends around the world who are hopeful that democracy can take hold and that the poverty and suffering of many Bangladesh people can be alleviated through good governance, meaningful political deliberations, and sound policy-making. The Awami League is critical to this long-term process as a strong party in opposition in the next parliament and as a contender in future free and fair elections.

Sincerely,
Jimmy Carter.

ভারতই শেখ হাসিনার শেষ ভরসা

বাংলাদেশ বর্তমানে একটি তালেবানী রাষ্ট্র এবং জোট সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা সংখ্যালঘুদের উপর চরম নির্যাতন চালাচ্ছে বলে প্রচারণা চালিয়েও আমেরিকাকে উত্তেজিত করতে না পেরে তিনি হতাশ হয়ে ভারতের হস্তক্ষেপের আশায় তার কর্মতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছেন।

গত মাসে (২০০৪) ভারতের জাতীয় নির্বাচনে কংগ্রেস দল বিজয়ী হওয়ার পর কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকার কায়েম করে। নবগঠিত সরকারের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং তার সরকারের বিদেশনীতি ঘোষণা করে প্রতিবেশী সকল দেশের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। বিজেপির বাজপেয়ী সরকারের আমলের আচরণে অতিষ্ঠ ও ক্ষুব্ধ বাংলাদেশ ঐ ঘোষণায় আশান্বিত হয় যে, মনমোহন সরকার থেকে সুপ্রতিবেশীসুলভ আচরণ আশা করা যায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রী এম মোর্শেদ খান দিল্লি সফর থেকে ফিরে এসে ভারত সরকারের নেতৃবৃন্দের উদার মনোভাবে খুবই সন্তোষ প্রকাশ করেন। তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ উত্থাপন করেননি।

www.pathagar.com

গত জুলাই (২০০৪) মাসে বাংলাদেশে যখন ভয়াবহ ব্যাপক বন্যায় ৩/৪ কোটি মানুষ দুর্গতি পোহাচ্ছে তখন শেখ হাসিনা জননেত্রী ও সংসদে বিরোধী দলীয় নেতার দায়িত্ববোধ নিয়ে দুর্গত জনগণের পাশে না দাঁড়িয়ে দিল্লি যাওয়া কেন অপরিহার্য মনে করলেন, সে প্রশ্ন অনেকের মনেই জেগেছে। কারণ তার উপর এমন কোন সরকারি দায়িত্ব ছিলো না যে, দেশে বন্যা দুর্গতদের পাশে দাঁড়াবার চেয়ে দিল্লি সফর অধিক গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য হতে পারে।

বাংলাদেশে ভারতের হাই কমিশনার বীণা সিক্রি তার বাসভবনে যেয়ে ভারত সরকারের আমন্ত্রণ জানান। এটাও বিস্ময়কর। নতুন ভারতীয় সরকার বাংলাদেশের সরকার-প্রধানকে দাওয়াত দেবার আগে বিরোধী দলের নেতাকে নিমন্ত্রণ করাটা কি স্বাভাবিক মনে হয়? তিনি সরকারি দাওয়াতে যাওয়া সত্ত্বেও ঘোষণা করলেন যে, ব্যক্তিগত সফরে যাচ্ছেন। অথচ তিনি সেখানে রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, কংগ্রেস দলীয় প্রধান, বিরোধী দলের প্রধানের সাথে সাক্ষাৎ করলেন।

ফিরে এসে তিনি নিজেই সফরের বিবরণ দিয়ে দেশবাসীকে জানালেন, ভারতের নেতৃবৃন্দ তার কাছে জানতে চাইলেন যে, ভারতের পূর্বাঞ্চলের রাজ্যসমূহের রাষ্ট্রদ্রোহীরা বাংলাদেশে আশ্রয় পায় কিনা? তিনি বলেন, এ প্রশ্ন শুনে তিনি খুবই বিব্রতবোধ করেন ও লজ্জিত হয়ে তাদেরকে জানান যে, এ বিষয়ে বর্তমান সরকারই জওয়াব দেবে, তিনি এ বিষয়ে জানেন না।

তিনি ক্ষমতায় থাকাকালে বিজেপি সরকার এ মিথ্যা অভিযোগ করলে তিনি বলিষ্ঠভাবে তা অস্বীকার করেন। এখন তিনি না জানার ভান করে যা বললেন তা খুবই ইঙ্গিতপূর্ণ। তারা সহজেই বুঝে নিলো যে, হাসিনা সরকারের আমলে বিদ্রোহীরা প্রশ্রয় না পেলেও বর্তমান 'তালেবান' সরকারের আমলে অবশ্যই বিদ্রোহীদেরকে সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। এ প্রশ্নের জওয়াবে বলিষ্ঠ প্রতিবাদ করাই দেশপ্রেমের দাবি ছিলো। তিনি অবশ্যই জানেন যে, এ অভিযোগের কোন ভিত্তিই নেই।

শেখ হাসিনার এ সফরের পর থেকেই ভারতের নেতাদের সুর একদম বদলে গেলো। তারা আগের চেয়েও বেশি জোর দিয়ে ঐ অভিযোগ উচ্চারণ করতে লাগলেন। অতিষ্ঠ হয়ে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী তীব্র প্রতিবাদ করলেন এবং চ্যালেঞ্জ করে বললেন, হেলিকপ্টার রেডি আছে। আপনারা এসে চিহ্নিত করুন কোথায় কোথায় বিদ্রোহীদের ক্যাম্প আছে। ভারতীয় হাই কমিশনার পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যের ধরন ও ভাষায় বিস্ময় ও ক্ষোভ প্রকাশ করলেন। দিল্লিতে হাই কমিশনারকে ডেকে পাঠানো হলো। কয়েক দিন পরই ভারতের স্বরাষ্ট্র সচিব বীরেন্দ্র সিং-এর ঢাকায় আসবার কথা ছিলো। ঐ বক্তব্যের প্রতিক্রিয়ায় তার আসা মুলতবি হয়ে যায় কিনা সে আশঙ্কাও কোন কোন মহল থেকে প্রকাশ করা হয়। কিন্তু ভারত সরকার আর তেমন কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া প্রদর্শন করেনি। এতে বুঝা গেলো, সত্যি কথা জোরালো ভাষায় ও নির্ভীকভাবে বললে মেনে নিতে হয়। ইতঃপূর্বে কোন পররাষ্ট্রমন্ত্রী এমন বলিষ্ঠ বক্তব্য রাখেননি বলেই হাই কমিশনার একটু প্রতিক্রিয়া দেখালেন।

www.pathagar.com

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার প্রতিক্রিয়া

গত আগস্টের (২০০৪) ২১ তারিখে শেখ হাসিনার জনসভায় গ্রেনেড হামলায় আওয়ামী লীগের মহিলা নেত্রী আইভী রহমানসহ ২৩ জন নিহত এবং অনেক নেতা-কর্মী আহত হন।

শেখ হাসিনা যে ট্রাকে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছিলেন এর আশপাশে প্রায় ডজনখানিক গ্রেনেড নিক্ষিপ্ত হয়। ট্রাকের মধ্যে একটাও পড়েনি। পড়লে হয়তো হাসিনার জীবনও বিপন্ন হতো। তাই ঘটনাটি বড়ই গুরুতর, আবেগময় ও উত্তেজনাপূর্ণ।

শেখ হাসিনার শাসনামলেও বহু সমাবেশে অনুরূপ হামলায় বহু লোক নিহত ও আহত হয়েছে। তিনি সে সবের কোনটিরই রহস্য উদঘাটনের উদ্দেশ্যে কোন তদন্ত কমিটি গঠন করেননি। কিন্তু প্রতিটি ঘটনার সাথে সাথে তিনি এর জন্য মৌলবাদী ও সাম্প্রদায়িক মহলকে দায়ী করেছেন। প্রকৃতপক্ষে কারা ঘটনার জন্য দায়ী তাদেরকে চিহ্নিত করে বিচার করার উদ্দেশ্যে কোন তদন্ত কমিশন গঠন করা প্রয়োজন মনে করেননি। কেন করেননি তা আজও রহস্যই রয়ে গেল।

২১ আগস্টের ঘটনার পরপরই জোট সরকার প্রধান সুপ্রিম কোর্টের একজন সিনিয়র বিচারপতিকে চেয়ারম্যান করে একটি তদন্ত কমিশন গঠন করেন। শেখ হাসিনা ঘটনার সাথে সাথেই সরাসরি প্রধানমন্ত্রীকে এর জন্য দোষী সাব্যস্ত করেন। পরে মৌলবাদীদেরকে, এমনকি সেনাবাহিনীকে পর্যন্ত দায়ী করেন। তিনি বিচার বিভাগীয় তদন্ত কমিশনকে প্রত্যাখ্যান করে আন্তর্জাতিক তদন্ত দাবি করেন। তদন্তে সহযোগিতা করার জন্য ইন্টারপোল ও আমেরিকার গোয়েন্দা সংস্থা এফবিআই বাংলাদেশে আসে। শেখ হাসিনার সাথে প্রধানমন্ত্রী সাক্ষাৎ করতে চাইলে তাচ্ছিল্যের সাথে উপেক্ষা করা হয়। শেখ হাসিনা ও তার দলের নেতৃবৃন্দ তদন্তকারীদেরকে সাক্ষাৎকার দিতেও অস্বীকার করেন। তারা জাতিসংঘ বা কমনওয়েলথ-এর পক্ষ থেকে তদন্ত চান। তাদের অজানা থাকার কথা নয় যে, এ জাতীয় কাজ ঐ দু'সংস্থার করণীয় নয়। আসলে তারা তদন্ত চান না। কারণ, তদন্ত ছাড়াই তারা তো নিশ্চিত করেই জানেন যে, এটা কারা করেছে। শেখ হাসিনার আমলে এ জাতীয় সকল ঘটনায়ই তিনি বিনা তদন্তে ঘোষণা করে দিতেন যে, মৌলবাদীরাই এটা করেছে। কারণ, তার টারগেট হলো জোট সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্বেষ ছড়ানো এবং বাংলাদেশকে তালেবানী রাষ্ট্র প্রমাণ করে বিদেশী শক্তিকে উসকানো।

শেখ হাসিনার টারগেট অনেকটা হাসিল হয়েছে

২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলার যে ব্যাখ্যা শেখ হাসিনা দিয়েছেন এর উদ্দেশ্য ভারতের কতক প্রভাবশালী পত্রিকা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে পেরেছে। দৈনিক দি হিন্দু, স্টেটসম্যান, আনন্দ বাজার, আজকাল ইত্যাদি পত্রিকার বাংলাদেশে ভারতের সেনাবাহিনীকে হস্তক্ষেপ করার আহ্বান জানিয়েছে। হাসিনার দিল্লি সফরের পর তারা নিশ্চিত হয়েছে যে, বাংলাদেশ ভারতের রাষ্ট্রদ্রোহীদেরকে আশ্রয় ও প্রশ্রয় দিচ্ছে। তদুপরি

www.pathagar.com

বাংলাদেশে তাদের পরম বন্ধু হিসাবে দায়িত্ব পালনকারী শেখ হাসিনাকে হত্যা করার জন্য তালেবানী জোট সরকার অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভারতের কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী, পশ্চিমবাংলার মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার বাংলাদেশে ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি আছে বলে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। উভয় মুখ্যমন্ত্রী তো রীতিমতো ভারত সরকারের নিকট দাবি জানিয়েছেন যে, ভুটানের মতো বাংলাদেশেও সেনাবাহিনী পাঠিয়ে তল্লাশি চালাতে হবে।

শেখ হাসিনা এবং তার সমর্থক বুদ্ধিজীবীগণ বাংলাদেশকে একটি ব্যর্থ ও অকার্যকর রাষ্ট্র বলে হীন অপপ্রচার চালাচ্ছেন। একটি সরকারকে ব্যর্থ বলে দোষ দেওয়া যায়, কিন্তু রাষ্ট্রকে ব্যর্থ ও অকার্যকর বলা অত্যন্ত মারাত্মক কথা। এ দ্বারা বুঝানো হচ্ছে যে, বাংলাদেশ একটি স্বাধীন সত্তা হিসাবে টিকে থাকার যোগ্য নয়।

আমরা বিস্ময় ও কৌতূহলের সাথে লক্ষ্য করছি যে, শেখ হাসিনা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে যে ধরনের অপপ্রচার চালাচ্ছেন এরই ভিত্তিতে ভারতের পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশের অস্তিত্বকেই চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। এ বিষয়ে ইংরেজি ভাষায় উদ্ধৃতি দিয়ে এর বাংলা অনুবাদের ঝামেলা পোহানো ও সময় ব্যয় না করে প্রখ্যাত কলামিস্ট ফরহাদ মাজহারের দৈনিক যুগান্তরে প্রকাশিত লেখা থেকে দৈনিক ইনকিলাবের বিশিষ্ট কলামিস্ট হারুনুর রশীদ তার মন্তব্যসহ গত ১৯/৯/০৪ তারিখে যেভাবে উদ্ধৃত করেছেন তা হুবহু তুলে দিলাম। ফরহাদ মাজহার সাহেবের লেখা থেকে যেসব অংশ আমার এ লেখার জন্য প্রয়োজন, হারুনুর রশীদ সাহেবের লেখায় তা সুন্দরভাবে সাজানো বলেই তা হুবহু নকল করলাম,

ফরহাদ মাজহার 'বাবুরামের চিঠি' শীর্ষক নিবন্ধে ভারতের এমভি কামাথ-এর এক বক্তব্যের উদ্ধৃতি দিয়েছেন। ২০০৩ সালের ১৬ মার্চ তারিখে প্রকাশিত উক্ত বক্তব্যে কামাথ বলেন,

"Let it be said in plain and simple language : Bangladesh has no business to exist. Its creation in 1947 was as historic a mistake as Lord Curzon's partition of Bengal was in 1905. Curzon's plan to divide Bengal was annulled because, in the end, Bengal's sense of unity prevailed.

Bangladesh, if it wants to survive, must return to India and India in turn must help it do so. The answer to the problem of illegal immigration of Bangladesh into India lies in one word : Federation. No matter how loudly the current rulers of Bangladesh may deny it. Bangladesh can never be self-sufficient. It has a cultural identity of its own that it shares with west Bengal. It could never be part of Pakistan and its creation should have been foreseen. So should its ultimate unity with India, no matter what resistance Begum Zia may offer, or the Jamat-e-Islami, what needs to be worked out is the nature of Bangladesh's re-conciliation with India.

www.pathagar.com

অর্থাৎ, এটা পরিষ্কার বলে দেওয়া দরকার যে, বাংলাদেশের টিকে থাকার কোন অধিকারই নেই। ১৯৪৭ সালে এর সৃষ্টি ছিলো তেমনি একটি ভুল, যেমনি ভুল ছিলো ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জন কর্তৃক বাংলাকে বিভক্ত করার পরিকল্পনা। কার্জনের পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গিয়েছিলো। কারণ অবশেষে বাংলার এক থাকার চেতনার জয় হয়েছিলো। বাংলাদেশকে যদি থাকতেই হয়, তো তাকে ভারতের মধ্যেই আবার ফিরে আসতে হবে এবং ভারতকেও অবশ্যই সহায়তা দিতে হবে এটা বাস্তবায়ন করার জন্য। বাংলাদেশ থেকে ভারতে অবৈধ অনুপ্রবেশ সমস্যার একটিই সমাধান, তা হলো ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের ফেডারেশন। বাংলাদেশের বর্তমান শাসকরা এটা যতই অস্বীকার করুক না কেন, বাংলাদেশ কখনোই স্বয়ংসম্পূর্ণ হতে পারবে না। বাংলাদেশের একটা সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য আছে বটে, যা পশ্চিমবঙ্গেরই অনুরূপ। এটা (বাংলাদেশ) কখনোই পাকিস্তানের অংশ হওয়ার কথা ছিলো না এবং এটা তখনই বুঝা উচিত ছিলো। এমতাবস্থায় বেগম জিয়া বা জামায়াত-ই-ইসলামী যত প্রতিরোধই করুক না কেন, বাংলাদেশকে শেষ পর্যন্ত ভারতের সঙ্গে যুক্ত হতেই হবে। যা প্রয়োজন তা হচ্ছে এটা কি প্রক্রিয়ায় হবে, সেটা খুঁজে বের করা।

কামাথ "The Problem that is Bangladesh" শীর্ষক এই নিবন্ধে যা বলেছেন, তা ভারতের শাসক-শোষক গোষ্ঠীরই অন্তরের কথা। বাংলাদেশকে ভারতীয় ফেডারেশনের অন্তর্ভুক্ত করতে পারলে, বাংলাদেশের গ্যাস নেওয়া, চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করা বা করিডোরের কোন সমস্যাই আর থাকে না। বাংলাদেশের মুসলমানদের দাবিয়ে দেবার ব্যাপারে প্রয়োজনে গুজরাটের পুনরাবৃত্তি হতে পারে।

কামাথ ধরেই নিয়েছেন যে, আওয়ামী লীগ এবং আওয়ামীপন্থী অন্যান্য রাজনৈতিক দল, উপদল ও বুদ্ধিজীবীরা ভারতের সঙ্গে বাংলাদেশের সংযুক্তির ব্যাপারে কোনই আপত্তি করবে না। ফরহাদ মাজহার লিখেছেন, "তিনি (কামাথ) ধরেই নিয়েছেন যে, ভারতের সঙ্গে যুক্ত হওয়ার এই রাজনীতি আওয়ামী লীগের রাজনীতি। আমি আজ পর্যন্ত কোন আওয়ামীপন্থী কলামিস্ট বা বুদ্ধিজীবীকে এই ধরনের লেখকদের বিরুদ্ধে বা ভারতে এই ধরনের প্রকট প্রচারণার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে দেখি না।" শুধু ফরহাদ মজহার কেন, আওয়ামী ঘরানার কোন নেতা-বুদ্ধিজীবীকে ভারতের কোন বক্তব্য বা কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে প্রতিবাদ তো দূরের কথা, মৃদু দ্বিমত জানাতেও কেউ কি কস্মিনকালেও দেখেছেন?

কংগ্রেস জোট সরকার ক্ষমতায় আসায় অনেকেই ভেবেছিলেন যে, এই সরকার বাংলাদেশের প্রতি বিজেপি সরকারের তুলনায় নমনীয় ও কম বিদ্বেষপ্রবণ হবে; কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে ভিন্ন।

ভারতের প্রতিরক্ষামন্ত্রী প্রণব মুখার্জী এবং পশ্চিমবঙ্গের প্রগতিশীল মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য পর্যন্ত অভিযোগ তুলছেন যে, বাংলাদেশে নাকি ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের আশ্রয় ও প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

www.pathagar.com

গত জুলাই মাসের মাঝামাঝি ভারতের সাবেক অতিরিক্ত সচিব ও 'র' কর্মকর্তা বিভূতিভূষণ নন্দী 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকায় লেখেন, "রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও কূটনৈতিকসহ সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের এই তৎপরতা (জঙ্গী মৌলবাদী ও ভারতীয় বিচ্ছিন্নতাবাদী 'উলফা' ও 'মিডলটা'-এর সন্ত্রাসীদের আশ্রয় ও ট্রেনিংদানের তৎপরতা) স্তব্ধ করার জন্য ভারতকে কার্যকর ও সক্রিয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। অন্যথায় ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় ভূখণ্ডকে ইসলামপন্থীদের কবল থেকে বাঁচানো যাবে না।" সর্বপ্রকার অস্ত্র প্রয়োগের ইঙ্গিতটি দ্ব্যর্থহীন।

এরপর গত ২৬ আগস্ট 'দি স্টেটসম্যান' পত্রিকা "খালেদার খেলার চাল ঃ হাসিনাকে হত্যা ও গণতন্ত্রের নির্বাসন" শিরোনামে লিখেছে যে, বাংলাদেশের সংখ্যালঘু ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতান্ত্রিক দলগুলোর ওপর যে নিগ্রহ চলছে, সে ব্যাপারে দিল্লী উদাসীন বলেই খালেদা জিয়ার জোট সরকারের বাড় এতো বেড়েছে। দিল্লীর উচিত, এখনই (বাংলাদেশের বিরুদ্ধে) কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করা।

এর তিনদিন পর ২৯ আগস্ট পত্রিকাটি তার সম্পাদকীয় নিবন্ধে লিখেছে যে, বাংলাদেশ এশিয়ার একটি অকার্যকর বেহায়া দেশ; নিষ্ক্রিয় প্রশাসন, ব্যাপক দুর্নীতি ও সন্ত্রাস দমনে ব্যর্থ। এই নিবন্ধে প্রকারান্তরে শেখ হাসিনাকে সংঘাতের রাজনীতি চালিয়ে যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয় এবং ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, "it is time for Delhi to act firmly" অর্থাৎ দিল্লীর কঠোর পদক্ষেপ নেওয়ার এখনই সময়।

২৭ আগস্ট তারিখে ভারতের অপর প্রভাবশালী দৈনিক 'দি হিন্দু' পত্রিকায় ভারতের খ্যাতনামা সমরতত্ত্ববিদ ডঃ সি. রাজমোহন প্রায় সরাসরিই বাংলাদেশ, নেপাল ও মালদ্বীপের উপর শক্তি প্রয়োগের পথ খোলা রাখার সুপারিশ করেন। এদের মতে, আশপাশের ব্যর্থ রাষ্ট্রসমূহ সার্থক রাষ্ট্রের জন্য বিপজ্জনক বিধায় শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে এসব রাষ্ট্রকে অবদমিত বা দখল করা ব্যতীত সার্থক রাষ্ট্রের বিপন্মুক্ত হওয়ার অপর কোনই উপায় নেই।

এর ৪ দিন আগে ২৩ আগস্ট তারিখে ভারতের আর এক বিশেষজ্ঞ সুভাষ কাপালিয়া ইন্টারনেটে প্রচার করেন যে, ব্যর্থ রাষ্ট্রসমূহ তাদের প্রতিবেশীদের জন্য হুমকিস্বরূপ। বাংলাদেশকেও ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে উল্লেখ করে কাপালিয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে উসকানি দেন বাংলাদেশে হস্তক্ষেপ করার জন্য।

মোট কথা, ভারত বাংলাদেশকে দখল করে ভারতের একটি প্রদেশে পরিণত না করলেও, ওরা যে এখানকার তথাকথিত ইসলামী মৌলবাদী ও ভারতীয় সন্ত্রাসীদের আশ্রয়দাতাদের শায়েস্তা করার অজুহাতে বাংলাদেশে সশস্ত্র হামলা চালিয়ে জোট সরকারকে উৎখাত করে তাদের আজ্ঞাবহ একটি সরকারকে ক্ষমতায় বসানোর জন্য ক্ষেত্র প্রস্তুত করছে– এটাই হলো অনেকের ধারণা। অনেকের এটাও ধারণা যে, ভারত যদি বাংলাদেশের উপর সশস্ত্র হামলা চালিয়েই বসে, তাহলে আওয়ামী লীগ এবং তার মিত্ররা প্রতিরোধ তো দূরের কথা, এর কোন প্রতিবাদও করবে না; বরং

www.pathagar.com

সর্বতোভাবে ভারতীয় হানাদারদের সহায়তাই প্রদান করবে। আর আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী, মুনতাসীর মামুন, আবেদ খান, ওয়াহিদুল হক প্রমুখ তাবৎ ইলামদ্রোহী বুদ্ধিজীবীরা যে মহানন্দে কাছা-কোঁচা, লুঙ্গি-প্যান্ট-পায়জামা খুলে উদ্বাহু নৃত্য করতে থাকবেন, সেটা নাকি হবে রীতিমতো একটা দর্শনীয় ব্যাপার।

অনেকের মনে এই প্রশ্নও দেখা দিয়েছে যে, গত কয়মাস যাবৎ বাংলাদেশে যে বেপরোয়া বোমাবাজি ও হুমকির ঘটনা ঘটছে, এগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশে সরাসরি হামলা চালানোর ক্ষেত্র প্রস্তুতের কোন সম্পর্ক নেইতো? গত ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার ব্যাপারও একই উদ্দেশ্যে প্রণোদিত নয়তো? এই যে মাদারীপুরের রাজৈরে ভারত থেকে আসা ২৬ হাজার চকোলেট বোমা এবং সিলেটে উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন বিস্ফোরক TNT ও আরডিএক্স ডিনামাইট ধরা পড়লো- এগুলোও বাংলাদেশের অভ্যন্তরে চরম নৈরাজ্য ও অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রেরিত বা আনীত নয়তো?"

ভারতের বৈরী আচরণ

পাকিস্তান আমলে পূর্বপাকিস্তানের সাথে ভারত যে বৈরী আচরণ করেছে সেটা ভারতের পাকিস্তান বিরোধিতারই অংশ; কিন্তু ভারতের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক, কূটনৈতিক ও সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমে বাংলাদেশ একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে মানচিত্রে অবস্থান লাভ করার পর বাংলাদেশের সাথে ভারতের আচরণে বৈরিতার মাত্রা আরও বেড়ে যাওয়ায় এ কথা প্রমাণিত হয়েছে যে, বাংলাদেশকে স্বাধীন রাষ্ট্রের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করা ১৯৭১ সালে তাদের উদ্দেশ্য ছিল না। বাংলাদেশকে একটি তাঁবেদার রাষ্ট্র ও ভারতীয় পণ্যের বাজার হিসাবে ব্যবহার করার মহান উদ্দেশ্যেই তারা প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে।

তাদের এ হীন উদ্দেশ্যের তাজা প্রমাণ হলো গত ৭ সেপ্টেম্বর (২০০৪) তারিখে ঢাকায় অনুষ্ঠিত "বাংলাদেশ-ইন্ডিয়া ডায়লগ ফর ইয়াং জার্নালিস্ট"-এর সম্মেলনে ভারতীয় হাই কমিশনার বীণা সিক্রির বক্তব্য ও এর প্রতিক্রিয়ায় বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খানের স্বতঃস্ফূর্ত জোরালো ভাষণ। বীণা সিক্রি বলেন, বাংলাদেশ পানি পায় ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। তাই বাংলাদেশের সমস্যা আদৌ পানির প্রাপ্যতা নয়; বরং পানির ব্যবস্থাপনা। উভয় দেশের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়া উচিত। ভারতকে নৌ ও রেলওয়ে ট্রানজিট ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে দেওয়া বাংলাদেশের কর্তব্য।

স্বাভাবিকভাবেই হাই কমিশনারের এ ধরনের ধৃষ্টতাপূর্ণ মুরুব্বিয়ানা নির্দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দেশপ্রেমে আঘাত লেগেছে। তিনি প্রধান অতিথির ভাষণ দিতে উঠে সচিবদের ড্রাফট করা বক্তব্য বাদ দিয়ে এক্সটেম্পোর ভাষণে দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তার সাথে কড়া জওয়াব দেন। দৈনিক ইনকিলাবের ১৫/৯/০৪ তারিখে জনাব হারুনুর রশীদ তার মন্তব্যসহ মন্ত্রীর বক্তব্য যেভাবে তুলে ধরেছেন তা এখানে পরিবেশন করছি, "ব্যাস তারপরই ফাটলো সেই অপ্রত্যাশিত অবাক করা বোমা। প্রধান অতিথির

www.pathagar.com

ভাষণ দিতে উঠে সচিবদের মুসাবিদা করা লিখিত বক্তব্য বাদ দিয়ে এক্সটেম্পোর ভাষণে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান দ্ব্যর্থহীন দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন :

১. ভারত পানি ব্যবস্থার পরামর্শ দেয়। অথচ প্রয়োজনের সময় কখনোই বাংলাদেশকে পানি দেয় না ভারত। খরার মৌসুমে পানি আটকে রাখে, আর বন্যার সময় কোন পূর্বসতর্কতা ব্যতিরেকেই সমস্ত স্লুইস গেট খুলে দিয়ে বাংলাদেশকে ভাসিয়ে দেয়। তিনি প্রশ্ন রাখেন, এটা কোন ধরনের দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা?

২. ভারত বার বার অভিযোগ করে যে, বাংলাদেশ ভারতীয় সন্ত্রাসীদের প্রশ্রয় দিচ্ছে, এখানে তাদের ক্যাম্প আছে ইত্যাদি। কিন্তু বাংলাদেশের কোথায় এসব ক্যাম্প আছে তার কোন নাম-ঠিকানাই ভারতীয়রা কখনোই দেয় না। অথচ বাংলাদেশের বিচ্ছিন্নতাবাদী বঙ্গভূমি-ওয়ালারা কোলকাতায় প্রকাশ্য অফিস করছে (গেরুয়া কাপড় পরে প্রকাশ্যে সশস্ত্র মহড়াও দিচ্ছে) এবং বাংলাদেশের কোন কোন জেলা নিয়ে বঙ্গভূমি গঠন করা হবে তার মানচিত্রও ছাপিয়েছে। পাবর্ত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদীরাও ভারত থেকেই পেয়েছে অস্ত্র ও ট্রেনিং। ভারতের কোথায় কোথায় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের ঘাঁটি আছে তা নাম-ঠিকানা ও ফ্যাক্স ফোন নাম্বারসহ ভারতকে জানানো হয়েছে; কিন্তু ভারত এসব তৎপরতা বন্ধ করছে না। বাংলাদেশের সন্ত্রাসীরাও ভারতে প্রকাশ্য ঘুরে বেড়াচ্ছে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী ভারতীয়দের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে বলেন, আমাদের হেলিকপ্টার প্রস্তুত আছে; যেখানেই যেতে চান নিয়ে যাবো; দেখিয়ে দিন বাংলাদেশের কোথায় ভারতীয় সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি আছে।

৩. ভারত মুক্তবাণিজ্য চুক্তির কথা বলে। অথচ বাস্তব অবস্থা কী? প্রতিবছর ভারত থেকে বাংলাদেশে আসে গড়ে ৪ বিলিয়ন ডলার (২৪,০০০ কোটি টাকার পণ্য)। তিনি ভারতীয়দের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, "গুলশান এক নম্বর থেকে দু'নম্বর পর্যন্ত ঘুরে দেখে আসেন, দেখবেন, সারি সারি ভারতীয় বিজনেস হাউজ, দেখবেন ভারতীয় পণ্যে বাংলাদেশ সয়লাব হয়ে আছে। অথচ ভাজা ও চচ্চড়ি খাওয়ার জন্য কিছু ইলিশ মাছ এবং সামান্য কিছু সিরামিক সামগ্রী ও জামদানি শাড়ি ব্যতীত আর প্রায় কিছুই নেয় না ভারত। ডাম্পিং ও স্ট্যান্ডার্ডাইজেশনের কথা বলে আটকে দেয় বাংলাদেশের পণ্যের আমদানি। ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাংক এলসি খোলার অনুমতিও দেয় না। উত্তর-পূর্ব ভারতে কয়েক কোটি টাকার বাংলাদেশী পণ্য যেতো। বায়নাক্কার দরুন সেটাও বন্ধ হওয়ার উপক্রম।" মোর্শেদ খান আরও প্রশ্ন রাখেন, 'ভারতের মতো আমরাও যদি আমাদের বিএসটিআই-এর অনুমোদন বাধ্যতামূলক করে দিই তাহলে কোথায় যাবে ভারতের বছরে ৪ বিলিয়ন ডলারের ব্যবসা?

৪. বলা হয়, বাংলাদেশে ধর্মীয় সহনশীলতা নেই। অথচ ভারতের গুজরাটে যখন ভয়াবহ মুসলিম নিধনযজ্ঞ চলে, তখনও বাংলাদেশের একজন মাত্র হিন্দুর উপরও কোনরূপ আক্রমণ হয়নি।

www.pathagar.com

৫. ভারতের কিছু কিছু পত্রিকা সম্প্রতি বাংলাদেশের সামরিক হস্তক্ষেপ করার জন্য ভারতের প্রতি উসকানি দিচ্ছে। এ সমস্ত পত্রিকাকে গার্বেজ বলে উল্লেখ করে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, "বাংলাদেশ তো একটা স্বাধীন দেশ। বর্তমান বিশ্বে এ ধরনের হস্তক্ষেপের কথা ভাবাই যায় না। এমতাবস্থায় এ ধরনের হস্তক্ষেপের উসকানি কোন্ ধরনের সমঅধিকার? কোন্ ধরনের গণতন্ত্র?"

৬. গত ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সমাবেশে গ্রেনেড হামলার পর ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের বিরোধীদলীয় নেত্রীকে সরাসরি টেলিফোন করে সমবেদনা জানান (অথচ কূটনৈতিক শিষ্টাচার দাবি করে যে, ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী প্রথমে বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রীর কাছেই সমবেদনা জ্ঞাপন করবেন) ভারতের পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ ব্যাপারে বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রীকে পত্র লেখেন ঘটনার এক সপ্তাহ পর। পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'এর ফলে বাংলাদেশের জনগণের মনে এমন ধারণা সৃষ্টি হতেই পারে যে, বাংলাদেশের একটিমাত্র দলের সঙ্গেই ভারতের সম্পর্ক রয়েছে।'

বস্তুত ১৯৭১ সালে ভারত যখন তার চিরশত্রু পাকিস্তানকে ভাঙার জন্য বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের প্রতি সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করে, তখনও তারা চায়নি যে, বাংলাদেশ একটি যথার্থ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে আবির্ভূত হোক। তারা চেয়েছিলো বাংলাদেশ হবে তাদের পদানত আজ্ঞাবহ একটি উপনিবেশ মাত্র। তাই তারা ১৯৭১-এ ভারত-প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যে ৭ দফা চুক্তি করেছিলো, তাতে দ্ব্যর্থহীন ভাষায়ই বলা হয়েছিলো যে, 'স্বাধীন' বাংলাদেশের প্রশাসনে নিযুক্ত হবে ভারতীয় কর্মকর্তারা। বাংলাদেশের নিজস্ব কোন সেনাবাহিনী থাকবে না, ভারতীয় সৈন্য বাংলাদেশে অবস্থান করবে, মুক্তিবাহিনী থাকবে ভারতীয় বাহিনীর আধিপত্যে এবং বাংলাদেশের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভারতীয় পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের নির্দেশ মতো চলবে। যে দলের লোকেরা ভারতের সঙ্গে এ ধরনের চুক্তি করতে পেরেছিলো, তাদেরকে ভারত যে আপন ভাববে এবং মদদ দেবে, এটাতো খুবই স্বাভাবিক।

সম্প্রতি ৪ দলীয় জোট সরকারের ওপর ভারত খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছে সম্ভবত এজন্য যে, এই সরকার ভারতকে গ্যাস এবং ট্রানজিট বা করিডোরতো দেয়ইনি, উল্টো পানির হিস্যা, বাণিজ্যিক ভারসাম্য ইত্যাদির কথা একটু জোরেশোরেই বলছে।

প্রসঙ্গত আরও উল্লেখযোগ্য যে, শুধু পররাষ্ট্রমন্ত্রী এম মোর্শেদ খানই নন, স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী বেগম খালেদা জিয়াও গত ১ সেপ্টেম্বর দৈনিক বাংলাবাজার পত্রিকার সম্পাদক জাকারিয়া খানের সঙ্গে মতবিনিময় করতে গিয়ে বলেন, "ওরা চায় এ দেশের তাঁবেদার পুতুল সরকার। বিএনপি কোনদিনই তা হতে দেবে না। আমার চাওয়া পাওয়ার কিছুই নেই। আমি চাই এ দেশের ভবিষ্যৎ প্রজন্ম যেন সম্মানের সাথে মাথা উঁচু করে উন্নত জীবনযাপন করতে পারে। কিন্তু ওরা তা হতে দিতে চায় না। আমরা আমাদের সকল প্রতিবেশীর সঙ্গে সম্মানজনক সুসম্পর্ক প্রত্যাশা করি, কিন্তু ওরা তা চায় না। ওরা আমাদের দেশ থেকে সবকিছু নিতে চায়, বিনিময়ে কিছুই

www.pathagar.com

দিতে চায় না।" কেন ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যিকসহ কোন ক্ষেত্রেই ক্ষমতার ভিত্তিতে সম্পর্ক গড়ে তোলা সম্ভবপর হয় না, এ প্রশ্নের জবাবে বেগম খালেদা জিয়া বলেন যে, ভারতের শক্তিশালী, দেশপ্রেমিক ও সুশিক্ষিত আমলাতন্ত্র থাকায় ক্ষমতার পরিবর্তন হলেও নীতির তেমন একটা পরিবর্তন হয় না, কিন্তু বাংলাদেশ সেক্ষেত্রে দুর্বল। আর একটি কথা অবশ্য বেগম খালেদা জিয়া এই প্রসঙ্গে বলেননি। তাহলো এই যে, ভারতের জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে সেখানকার সরকার ও বিরোধী দলীয়রা সততই একাট্টা; কিন্তু বাংলাদেশের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা সম্পূর্ণ ভিন্ন। শেখ হাসিনা দেশ জাতি গোল্লায় গেলেও বেগম খালেদার সঙ্গে কোনরূপ আলোচনায়ই বসবেন না বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ এবং তার দেশীয় ও বিদেশী গুণগ্রাহীদের মতে এটাই হলো দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ স্ট্যান্ড।

বাংলাদেশের পররাষ্ট্রমন্ত্রী যে অনুষ্ঠানে উপরিউক্ত বক্তব্য দেন, সে অনুষ্ঠানে বীণা সিক্রি ও কতিপয় রাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন ভারতের প্রখ্যাত কলামিস্ট কুলদীপ নায়ারও। মোর্শেদ খানের বক্তব্যে ভারতীয় হাই কমিশনার বীণা সিক্রি প্রথমে বিস্ময় ও পরে হতাশা ব্যক্ত করেন। ঘটনার পরপরই তিনি দিল্লী চলে যান। অতঃপর ভারতের পররাষ্ট্র সচিব শ্যাম শরনও গত ১০ সেপ্টেম্বর মোর্শেদ খানের বক্তব্যে বিস্ময় ও হতাশা ব্যক্ত করেন এবং ভারতে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাই কমিশনার হেমায়েত উদ্দিনকে ডেকে পাঠিয়ে ভারত সরকারের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দেন।

ভারতের আগ্রাসী নীতি

এ বিষয়ে প্রখ্যাত কলামিস্ট ও কবি ফরহাদ মাজহার দৈনিক যুগান্তরে ৩ সেপ্টেম্বর (২০০৪) চমৎকার একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তার লেখাটাই এখানে তুলে দিলাম ঃ

যাওয়া যাক ইন্টারনেটে গত শুক্রবারের অর্থাৎ আগস্ট মাসের ২৭ তারিখে ভারতীয় পত্রিকা The Hindu-র কাছে। ভারতের খুবই প্রভাবশালী পত্রিকা। সেখানে সি রাজমোহন নামে ভারতের প্রভাবশালী একজন পররাষ্ট্রনীতি বিশ্লেষক একটি লেখা লিখেছেন, Ending the regional drift- অর্থাৎ এই অঞ্চলের দোদুল্যমান আঞ্চলিক পরিস্থিতি ভারত কিভাবে সামাল দেবে সেই সম্পর্কে। তার লেখার লক্ষ্যবস্তু তিনটি ছোট প্রতিবেশী দেশ। এক বাংলাদেশ, দুই নেপাল এবং তিন মালদ্বীপ। তিনি বলছেন, এই তিনটি দেশই ভারতের নিরাপত্তার জন্য সংকট। তিনটি দেশই 'অকার্যকর রাষ্ট্র' হওয়ার পর্যায়ে চলে গেছে। ভারত সবসময় ছোট দেশগুলোর প্রতি তার নীতি কি হবে সেই বিষয়ে দোদুল্যমান থেকেছে; কিন্তু এখন আর দোদুল্যমান থাকা যাবে না। এখন এসব দেশে সামরিক অভিযান চালিয়ে ভারতের স্বার্থের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ পরিস্থিতি তৈরি করতে হবে।

ভারত কি তাহলে একটি গণতান্ত্রিক দেশ নয়? আহ্! এই কথা তুলে কি করব আমরা, ওদের আগ্রাসন ঠেকাতে পারব? কোন গণতান্ত্রিক দেশ কখনোই ছোট ও শক্তিহীন প্রতিবেশী রাষ্ট্রে সামরিক অপারেশান চালিয়ে তাদের নিজেদের স্বার্থের অনুকূল পরিস্থিতি তৈরির কথা এত নগ্নভাবে বলে না। অন্তত 'দি হিন্দু'র মতো অতি

www.pathagar.com

প্রভাবশালী পত্রিকায় তো নয়ই। অন্য দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ যে গর্হিত কাজ ও অপরাধ এটা কিন্তু সি রাজমোহন জানেন। তিনি লিখছেন,

Non-intervention in the internal affairs of the neighboring countries in indeed a sensible proposition. Yet given the deepening crisis in the region and the long-term consequence of state failure, India might have no option but to develop a pro-active policy to encourage internal political change within the subcontinent. That is part of the burden of being a responsible power in the international system India will have to develop both the instrument of persuasion as well as define the limits to its use of force in the region. (http:// w w w. the hindu. com/2004/08/27/stories/2004082701661000. htm)

বলা হচ্ছে উপমহাদেশে 'অকার্যকর' বা 'ব্যর্থ রাষ্ট্র' হয়ে যাচ্ছে যেসব দেশ তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করে তাদের রাজনৈতিক পরিবর্তন, অর্থাৎ ভারতের সেবাদাসে পরিণত করতে হবে এখন। যদি কথায় কাজ না হয় তাহলে সামরিক হস্তক্ষেপের মাধ্যমেই এই কাজ ভারতকে করতে হবে। আঞ্চলিক শক্তি হিসেবে এটা এখন ভারতের দায়দায়িত্ব হয়ে উঠেছে।

গত সপ্তাহে নেপালের মাওবাদীরা কাঠমন্ডু অবরোধ করে রেখেছিল। ভারতের সামরিক শক্তির ধমকে মাওবাদীরা সেই অবরোধ তুলে না নিলেও ওতে কিছুটা কাজ হয়েছে বলে সি রাজমোহন মনে করেন। ভারত যে প্রয়োজনে এই পাহাড়ি রাষ্ট্রটিকে মাওবাদীদের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনী নিয়োগ করবে সেটা পরিষ্কার ভারত বুঝিয়ে দিয়েছে। সি রাজমোহন বলেছেন।

Clearly, the blockade shook the Indian Government into signalling that it would not allow the collapse of the state structures in Nepal. If Maoist were testing India's resolve in preventing the emergence of a radical dispensation in Kathmandu, the answer from New Delhi has been both strong and unambiguous.... New Delhi should combine its will to intervene militarily in Nepal with a whole range of other policy instruments....

মাওপন্থী বিপ্লবীরা কাঠমন্ডু অবরোধ করে তাদের যে শক্তি ও গণসমর্থন প্রদর্শন করেছে, তাতে নয়াদিল্লী ভড়কে গেছে বলে রাজমোহন মনে করেন। কিন্তু তার প্রত্যুত্তরে ভারত যখন সামরিক অভিযান চালিয়ে নেপালের গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক পরিবর্তনের সম্ভাবনা রুখে দেওয়ার সংকল্প হাড়ে হাড়ে জানিয়ে দিয়েছে, তাকে তিনি প্রশংসা করেছেন। ভারত ছোট দেশগুলোকে তার সেবাদাস ছাড়া আর কোন সম্মানিত স্থান দিতে রাজি না। নেপালের জনগণ তার বিরুদ্ধে লড়ছে দীর্ঘদিন। এখন রাজমোহন ভারতের শাসক শ্রেণীর পক্ষ থেকে জানিয়ে দিলেন, সেবাদাস হওয়া ছাড়া নেপালের আর কোন ভবিষ্যৎ নেই। ভারতীয়দের গোলাম হয়েই নেপালকে থাকতে হবে। নেপালে নানা

www.pathagar.com

অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ড চালিয়ে এবং মাওবাদীদের বিরুদ্ধে নানাবিধ অপপ্রচার চালিয়েও যখন নেপালে মাওবাদীদের বিকাশ রুদ্ধ করা যায়নি তখন ভারত বলছে, আমরা সামরিক অভিযান চালিয়ে হলেও নেপালে সেই ধরনের রাজনৈতিক অবস্থাই বজায় রাখব যা ভারত চায়। ইরাকে নেপালি জিম্মিদের হত্যা এবং সেই হত্যাকে কেন্দ্র করে নেপালে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা বাধানো এবং সামরিক বাহিনী নামিয়ে কারফিউ দেওয়া ইত্যাদি ঘটনা এবার পাঠক রাজমোহনের কথাবার্তার সঙ্গে মিলিয়ে পড়ুন।

মালদ্বীপে প্রেসিডেন্ট আবদুল গাইয়ুম বিরোধী রাজনৈতিক দলের ওপর দমন-নিপীড়ন চালাচ্ছেন, এটা ভারতের সহ্য না। মালদ্বীপেও এখন ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপ দরকার, যাতে ন্যূনতম 'গণতন্ত্র' প্রতিষ্ঠা করা যায়।

'অকার্যকর রাষ্ট্র' হিসেবে বাংলাদেশ ভারতের আগ্রাসনের তালিকার মধ্যে আছে। বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা ভারতের কেন দরকার সেই বিষয়ে রাজমোহন বলছেন, Bangladesh is the sixth largest destination of Indian exports and shares a border with India that is longer than the one with China. তাহলে প্রথম কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক। ভারতীয় পণ্যের বাজার হিসেবে বাংলাদেশ প্রথম সারির মধ্যে ছয় নম্বরে। বিশেষত সীমান্তপথে বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের বাণিজ্য চলে। সেই বাণিজ্য স্বার্থ এবং সীমান্ত রক্ষা ভারতের জন্য জরুরি। এরপর বলছেন,

Nepal and Bangladesh might not have threatening armies but their potential to act as safe havens to forces hostile to India is unlimited. By just closing their eyes to anti-India activity on their soil, they can hurt New Delhi badly. Small countries in South Asia have a huge capacity to unravel India's security paradigm. The development in Nepal and Bangladesh in recent years have repeatedly pointed to this threat.

নেপাল আর বাংলাদেশের সেনাবাহিনীকে ভারত ভয় পায় না। আমাদের দেশপ্রেমিক সৈনিকরা দয়া করে এই কথাটির দিকে নজর দেবেন। আমাদের এখনকার প্রথাগত প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা দিয়ে আমরা দেশ রক্ষা করতে পারব না। রাজমোহনের মতো ভারতের নীতিনির্ধারকরা দি হিন্দুর মতো পত্রিকায় পরিষ্কারই বলছেন, তারা প্রয়োজনে বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালাবেন এবং তারা আপনাদের ভয়ে ভীত নয়। তাহলে বর্তমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কোন কাজে আসবে না, যদি না আমরা অবিলম্বে গণপ্রতিরক্ষার পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন শুরু না করি।

বাংলাদেশের সেনাবাহিনী ভারতের নিরাপত্তার জন্য হুমকি নয়। তাহলে হুমকি কিসের? বাংলাদেশে ভারতবিরোধী তৎপরতা চলে। এই দাবির কোন ভিত্তি নেই। কারণ দুর্বল দেশ হিসেবে বাংলাদেশ কখনোই ভারতের বিরুদ্ধে তৎপরতা চালাতে পারে না। এসব নিছকই আগ্রাসনের অজুহাত। এটাও সত্য যে, ভারতের একদিকে বিপ্লবী রাজনৈতিক দলগুলো গত এক দশকে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা এবং শক্তি অর্জন

www.pathagar.com

করেছে। কারণ, তারা হিন্দুত্ববাদী ও আধিপত্যবাদী ভারত চায় না। তারা চায় গণতান্ত্রিক ভারত। অন্যদিকে ভারতের পূর্বাঞ্চলের সাতটি রাজ্যের অধিবাসীরা মনে করে, ভারত তাদের দেশ হানাদার বাহিনীর মতো দখল করে রেখেছে। পাকিস্তান যেমন বাংলাদেশকে তাদের কলোনি বানিয়েছিল সেরকম উপনিবেশ বানিয়ে রেখেছে আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, নাগাল্যান্ড, অরুণাচল ইত্যাদি রাজ্য। ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের অধীনে এই দখলদারির সংকট মোচন সম্ভব নয়। যদি ভারত তাদের নিজেদের দেশের রাজনৈতিক সংকট সমাধান করতে না পারে, যদি তারা নিজেরা ভারতের অখণ্ডতা রক্ষা করতে না পারে, তাহলে ছোট দেশ হিসেবে বাংলাদেশের ওপর তারা দায় চাপাচ্ছে কোন যুক্তিতে? কিন্তু চোর না শুনে ধর্মের কাহিনী।

বাংলাদেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার তৃতীয় কারণ হচ্ছে 'অকার্যকর রাষ্ট্র'। বাংলাদেশ একটি অকার্যকর রাষ্ট্র। অতএব ভারতের নিরাপত্তার জন্য বাংলাদেশ অবশ্যই হুমকি। কেন বাংলাদেশ অকার্যকর রাষ্ট্র সেই কারণ জানতে হলে বাংলাদেশকে 'অকার্যকর রাষ্ট্র' বলে যারা ফতোয়া দিয়েছেন তাদের লেখালেখি পড়লেই তারা রাজমোহন এবং তার মতো ভারতীয় নীতিনির্ধারকদের যুক্তিও বুঝবেন। মূলত ভারতের নীতিনির্ধারকদের মনের কথা আগেভাগেই খোদ বাংলাদেশেই বলে দেওয়ার লোক বিস্তর আছে; আমরা শুনেছি। রাজমোহন বলেছেন, While the role of failing states and their ability to threaten both regional and global security has been debated after the events of September 11, 2001, it is only now that India is facing up to the issues involved. 'অকার্যকর রাষ্ট্র' নিয়ে ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর তারিখের ঘটনার পর থেকেই বলাবলি শুরু হয়েছে। ভারত এখন এই বাস্তবতার মীমাংসা করার জন্য তৈরি হচ্ছে। নেপাল ও বাংলাদেশ এবং মালদ্বীপ দক্ষিণ এশিয়ায় 'অকার্যকর রাষ্ট্র'। অতএব তারা যেন ভারতের নিরাপত্তার জন্য সংকট না হয় তার জন্য সামরিক অভিযান চালাবে ভারত এবং ভারতের ইচ্ছা অনুযায়ী এই দেশগুলোকে চলতে হবে। তাদের সমস্ত নীতি ঠিক করে দেবে ভারতের শাসক শ্রেণী। জয় হিন্দ!

সার্বভৌমত্বের বিপরীতে ভারত কি দেবে বাংলাদেশকে? বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের জন্য বাজারে একটু ছাড় দেবে। এতে বোঝা যায় বাংলাদেশের ব্যবসায়ীদের একটা অংশকেই তারা তাদের মিত্র বলেও ধরে নিচ্ছে।

২৭ আগস্টের রাজমোহনের এই লেখা পড়ে অতি অনায়াসেই মালদ্বীপের ঘটনা, নেপালের উত্তপ্ত পরিস্থিতি এবং ২১ আগস্ট আওয়ামী লীগের সভায় বোমা হামলার ছকটা আমরা ধরতে পারি। দেখা যাচ্ছে ভারতের শাসক শ্রেণীর ইচ্ছাটা অতি গোপন ও অপ্রকাশ্য কোন ব্যাপার নয়। খুবই ঘোষিত একটা ব্যাপার। এটাও বোঝা যাচ্ছে, ১১ সেপ্টেম্বরের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্রনীতির সঙ্গে ভারতের এই আগ্রাসন নীতি খুবই সঙ্গতিপূর্ণ। এই নীতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গি জড়িত রয়েছে ইসরাইল। এই কারণেই এই ধারাটিকে আমি ভারত-মার্কিন-ইসরাইলি অক্ষ বলে থাকি। নানা দিক থেকে এই অক্ষটির ওপর নজরদারি তীক্ষ্ণ করা আমাদের কাজ।

www.pathagar.com

এবার ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার একজন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাক্তন কর্মকর্তার লেখা পরীক্ষা করা যাক। ইনি ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকা The Statesman-এ লেখেন। এই পত্রিকাটি ২১ আগস্টের পর অত্যন্ত পরিকল্পিতভাবে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে প্রচারণা চালাচ্ছে। এর নাম বিভূতিভূষণ নন্দী। তার অন্যান্য লেখা সম্পর্কে আরেক দিন বলা যাবে। নন্দীবাবু ভারতের Research and Analysis Wing (RAW) নামক গোয়েন্দা সংস্থাটির প্রাক্তন এডিশনাল সেক্রেটারি। অবসর (?) নিয়ে তিনি লেখালেখি করছেন এবং সম্ভবত বাংলাদেশের পত্রপত্রিকা ও তার প্রাক্তন সংস্থার সঙ্গে জড়িত সাংবাদিকদের সঙ্গে তিনি ঘনিষ্ঠভাবেই যোগাযোগ রক্ষা করে চলেন। সে যাই হোক, একজন এডিশনাল সেক্রেটারি হিসেবে তার দেশের স্বার্থ দেখা তার কাজ। বাংলাদেশের কওমি মাদরাসাগুলোতে জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ হয় এবং বাংলাদেশের টুপি-পাগড়ি পরা মুসলমানমাত্রই যে তালেবান এবং মার্কিন ও ভারতীয় নিরাপত্তার জন্য হুমকি এই কাজটি তিনি অত্যন্ত সততার সঙ্গে করেন। বাংলাদেশে কোন্ জঙ্গি দল কোথায় কীভাবে কাজ করে এই তথ্য আমরা জানার আগেই তিনি জেনে যান এবং তার সঙ্গে যুক্ত বাংলাদেশের পত্রপত্রিকাগুলো সেই সব হুবহু ছাপায়। ভালোই লাগে তার তথ্য হুবহু আমাদের কয়েকটি পত্রপত্রিকায় পাঠ করতে পেরে। যেমন সম্প্রতি কওমি মাদরাসাগুলোর বিরুদ্ধে একটি দৈনিক এবং একটি সাপ্তাহিক পত্রিকায় যেসব খবর ছাপা হয়েছে তার প্রায় অধিকাংশই Research and Analysis Wing-এর বিভিন্ন প্রতিবেদনে পেয়ে যাবেন। কিংবা বাংলাদেশের প্রতিবেদনগুলোকে আশ্রয় করেই যে তারা বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতের পররাষ্ট্রনীতি নির্ধারণের যৌক্তিকতা প্রতিষ্ঠা করছেন সেটা পাঠক গবেষণা করলে ধরতে পারবেন অনায়াসে।

বিভূতিভূষণ নন্দী এই বছর মার্চ মাসেই রাজমোহনের মতোই বলেছেন, বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ভারতকে আরও সক্রিয় (Pro-active) ও আরও কঠোর (decisive) হতে হবে। এই প্রো-অ্যাকটিভ কথাটার মানে ভদ্র ভাষায় বাংলাদেশে সামরিক অভিযান চালানোর পরামর্শ দেওয়া। তিনি ভারতের পররাষ্ট্র বিভাগের সচিব এবং ব্রজেশ মিশ্রের সফর সম্পর্কে লিখতে গিয়ে বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রচারণা ও কর্মকাণ্ডের বিপদ সম্পর্কে ক্ষিপ্ত কথাবার্তা বলে এইভাবে শেষ করছেন :

Bangladesh poses hard security challenges for India. We have so far followed a pathetically soft policy towards that country verging on appeasement not befitting India's stature as the predominant power in the region. What we need is a more proactive and decisive stance in dealing with our wayward neighbour in the east. Sadly, our foreign policy mandarins the South Block lack the capability and the culture of strategic thinking and strategic action.

http: w w w. the statesman. net/ Page. archive. php? date= 2004-03-30&usrsess=1& clid=4&id= 67712)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ ভারতের নিরাপত্তার জন্য ভয়ানক হুমকি। ভারত এ যাবৎ বাংলাদেশের প্রতি যে নম্র অবস্থান নিয়েছে তা আর চলতে পারে না। এই অঞ্চলে ভারত একটি ক্ষমতাধর রাষ্ট্র। ফলে ভারত বাংলাদেশে ভারতবিরোধী প্রচারণা সহ্য করবে সেটা হতে পারে না। বাংলাদেশে ভারতকে সক্রিয়ভাবে হস্তক্ষেপ করতে হবে। সেই হস্তক্ষেপ বলা বাহুল্য সামরিক হস্তক্ষেপও বটে। দুঃখজনক বিভূতি বাবু বলেছেন, সাউথ ব্লক এটা বোঝে না। সাউথ ব্লক মানে, ভারতের যে গোয়েন্দা বিভাগ থেকে অন্য দেশে অন্তর্ঘাতমূলক তৎপরতা চালানো হয়।

২১ আগস্টের হত্যাকাণ্ড কারা ঘটিয়েছে আমরা জানি বা না জানি, এ ঘটনার ওপর সওয়ার হয়ে কী ঘটতে পারে সেটা আমরা কি কিছুটা আন্দাজ করতে পারছি না? নিশ্চয়ই পারছি।

এ দেশের সাথে ভারতের আচরণ

১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে ভারত যে নিয়তেই সহযোগিতা করে থাকুক তাদের অবদানকে অস্বীকার করার উপায় নেই। ঐ আন্দোলনের মাধ্যমে দেশবাসী ইসলামাবাদের আধিপত্য থেকে মুক্তি পেতে চেয়েছিলো; কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশের সাথে ভারতের আধিপত্যবাদী আচরণে জনগণ ভীষণ ক্ষুব্ধ। কারণ দিল্লির আধিপত্য মেনে নেবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করা হয়নি। বাংলাদেশের সাথে ভারতের বৈরী আচরণের তালিকা দীর্ঘ। কয়েকটি উদাহরণই যথেষ্ট ঃ

১. ভারত দাবি করে যে, বাংলাদেশকে তারাই স্বাধীন করেছে। পাক সেনাবাহিনী তাদের বাহিনীর নিকটই ১৬ ডিসেম্বরে আত্মসমর্পণ করেছে। তারা যদি মুক্তিযোদ্ধাদেরকে স্বীকৃতি দিতো তাহলে আত্মসমর্পণ অনুষ্ঠানে মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল ওসমানীকে অংশগ্রহণের সুযোগ দিতো।

২. যেহেতু বাংলাদেশকে তারাই স্বাধীন করে দিয়েছেন, সেহেতু তাদের মর্জিমতোই এ দেশকে চলতে হবে। তাই দায়ে ঠেকিয়ে আওয়ামী লীগ নেতাদেরকে ৭ দফা চুক্তি স্বাক্ষর করতে বাধ্য করেছে। ইন্দিরা গান্ধী শেখ মুজিবকে ২৫ বছরের এক চুক্তি করতেও বাধ্য করে।

৩. শেখ মুজিবকে ভারত ফারাক্কা বাঁধ চালু করার অনুমতি দিতে বাধ্য করে। প্রথমে পরীক্ষামূলকভাবে চালু করার কথা ছিলো। কিন্তু চালু করার পর আর বন্ধ করার দাবি জানাতে শেখ মুজিব সাহস পাননি। ফারাক্কা বাঁধ পাকিস্তান আমলে নির্মাণ করা হয়। পাকিস্তান এর প্রতিবাদ করলেও ভারত কোন পরওয়া করা প্রয়োজন মনে করেনি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ এর বিরুদ্ধে বহু বিক্ষোভ মিছিল করেছে। শ্লোগান ছিলো, "মরণ ফাঁদ ফারাক্কা বাঁধ ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও।" এ বাঁধ শুকনো মৌসুমে পানি আটক করে বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলকে মরুভূমিতে পরিণত করে এবং সারা দেশে নদীর নাব্যতা হ্রাস করে এবং বর্ষার মৌসুমে তাদের বন্যার পানি ছেড়ে দিয়ে বাংলাদেশকে ডুবিয়ে মারে।

www.pathagar.com

৪. বাংলাদেশের সাথে ভারতের বৈধ বাণিজ্যে তারা একতরফা পণ্য রপ্তানি করে। এর বদলে বাংলাদেশের পণ্য নিতে চায় না। ফলে বাংলাদেশ মারাত্মক বাণিজ্য ঘাটতির সম্মুখীন হয়। অবৈধ পথে ভারত ব্যাপকভাবে তাদের পণ্য বাংলাদেশে ঠেলে দেয়।

৫. বাংলাদেশের এক-দশমাংশ এলাকা জুড়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি জেলা। বনজ ও খনিজ সম্পদে সমৃদ্ধ এ বিশাল এলাকাকে বাংলাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করার হীন উদ্দেশ্যে সেখানকার উপজাতিদেরকে ভারতে বিদ্রোহের প্রশিক্ষণ দিয়ে ও অস্ত্রশস্ত্র সরবরাহ করে ২৩ বছর ধরে বাংলাদেশ সরকারকে নাজেহাল করার পর ১৯৯৬ সালে তাদের তাঁবেদার আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হওয়ার সুযোগে ভারত বিদ্রোহীদের সকল অন্যায় দাবি মেনে নিয়ে চুক্তি করতে শেখ হাসিনাকে বাধ্য করে। সে এলাকায় এখন বাংলাভাষী জনগণ নিজ দেশেই পরাধীন জীবনযাপন করছে।

৬. ভারতীয় সশস্ত্র বাহিনী বাংলাদেশের সীমান্ত এলাকায় বাংলাদেশীদেরকে হত্যা করা, অপহরণ করা, ফসল কেটে নিতে ভারতীয় দস্যুদেরকে সহায়তা করা ইত্যাদি বহু রকমের বাড়াবাড়ি করতেই থাকে।

৭. শেখ মুজিব থেকে বেরুবাড়ি এলাকার দখল নিয়ে চুক্তি অনুযায়ী এর বদলে তিন বিঘা করিডোরের দখল আজও দেয়নি। তালপট্টির বিরাট চর এলাকা জোর করেই দখল করে রেখেছে। শেখ হাসিনার শাসনামলে কুড়িগ্রামের বরাইবাড়ি দখলে রাখার অপচেষ্টাকালে ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিডিআর-এর হাতে চরম মার খায়। শেখ হাসিনা এর জন্য ভারতের কাছে ক্ষমা চেয়ে বরাইবাড়ি আবার তাদের দখলে ফিরিয়ে দেন।

বাংলাদেশে কোথা থেকে হামলা আসতে পারে?

বাংলাদেশের কোন সরকারই আজ পর্যন্ত ভারতের এতোসব বাড়াবাড়ি সত্ত্বেও ভারতের সাথে এমন কোন আচরণ করেনি, যার ফলে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করার কারণ ঘটতে পারে; বরং বাংলাদেশ প্রতিবেশীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার জন্য তাদের বাড়াবাড়ির বলিষ্ঠ প্রতিবাদও করেনি। কোন বৈরী আচরণে বাংলাদেশ আপত্তি জানালেও খুব নম্র ভাষায় তা প্রকাশ করেছে।

গত ৭ সেপ্টেম্বর পররাষ্ট্রমন্ত্রী মোর্শেদ খান সর্বপ্রথম একটু বলিষ্ঠ উচ্চারণ করায় হাই কমিশনার বিস্মিত ও ক্ষুব্ধ হয়েছেন এবং দিল্লিও ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া দেখিয়েছে। বৈরী আচরণের কারণেই এ দেশের জনগণ ভারতকে বাংলাদেশের বন্ধু মনে করে না। তাই বাংলাদেশের যারা ভারতকে পরম বন্ধু বলে দাবি করে জনগণ তাদের দেশপ্রেম সম্পর্কে প্রশ্ন তুলতেই পারে।

বাংলাদেশের প্রায় সাড়ে তিন দিকে ভারত। দক্ষিণপূর্ব সীমান্তে মায়ানমার (বার্মা) রয়েছে। ওখান থেকে বাংলাদেশের উপর হামলা হওয়া স্বাভাবিক নয়। দুদেশের মাঝখানে নদী থাকায় হামলা করা এতোটা সহজও নয়, যতটা ভারত থেকে সম্ভব। দক্ষিণে বঙ্গোপসাগরের আন্দামান দ্বীপপুঞ্জও ভারতের দখলে। আর বাংলাদেশের

www.pathagar.com

সারা স্থলভাগ ভারতের সাথে সংলগ্ন। ভারতের বাইরে থেকে কোন দেশের পক্ষে বাংলাদেশে হামলা করতে হলে ভারতের উপর দিয়েই আসতে হবে। তাই ভারত ছাড়া অন্য কোন দেশের পক্ষ থেকে বাংলাদেশে হামলা হওয়ার আশঙ্কা নেই। যদি এ দেশের উপর কোন সময় আক্রমণ করা হয়ই তাহলে একমাত্র ভারতের পক্ষেই তা সম্ভব। তাই জনগণ একমাত্র ভারত থেকেই হামলার আশঙ্কা করে।

কারা ভারতকে পরম বন্ধু মনে করে?

ভারতের এ অব্যাহত বৈরী আচরণ সত্ত্বেও যারা ভারতকে বন্ধু মনে করে তারা ভারতের কোন দোষই দেখতে পায় না। ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় বাংলাদেশে সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য সরকারকে নগ্নভাবে উসকিয়ে দেবার বিরুদ্ধে তারা মৃদু আপত্তি করাও কর্তব্য মনে করে না। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক কারণে কোন হিন্দুর উপর সামান্য যুলুমও করা হয়নি। তবুও শেখ হাসিনা বড়গলায় বিদেশে প্রচার করেছেন যে, বাংলাদেশে ব্যাপকহারে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন হচ্ছে। অথচ গুজরাটে মুসলমানদেরকে পাইকারি হারে হত্যা করা সত্ত্বেও বাংলাদেশে এর কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়নি। এমন উদার মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে এ দেশেরই কতক মতলবী রাজনৈতিক ব্যক্তি এভাবে মিথ্যা প্রচার করতে সামান্য লজ্জাও বোধ করে না।

বাংলাদেশে ভারতীয় হাই কমিশনার বীণা সিক্রিকে অভ্যর্থনা জানাবার জন্য একটি হোটেলে আওয়ামী লীগপন্থি বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে এক অনুষ্ঠানে বামপন্থি একটি দলের নেতা স্পষ্টভাষায় বললেন, "আমাদের স্বাধীনতা ভারতের অবদান। তাই ভারতের প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞ থাকতে হবে এবং তাদের আধিপত্য মেনেই চলতে হবে।"

বাংলাদেশে ভারতপ্রেমিকের একটি শক্তিশালী মহল না থাকলে ভারত এতোটা বেপরোয়া মনোভাব প্রদর্শন করতো না। তারা দেখতে পাচ্ছে যে, বাংলাদেশের উপর ভারতের সামরিক হস্তক্ষেপের জোর দাবি জানানো সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের মতো একটি বড় রাজনৈতিক দল ক্ষুব্ধ হওয়া দূরের কথা, লোকদেখানো ও দায়সারা আপত্তিও করছে না। নির্বাচনে শতকরা ৪০ ভাগ ভোটপ্রাপ্ত বৃহৎ একটি দল যদি ভারতের আগ্রাসী ভূমিকা কামনা করে তাহলে তারা দাপট দেখাতে দ্বিধা করবে কেন?

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের হুমকি

আওয়ামী লীগ ও বামপন্থি দলগুলোর চরম ইসলামবিরোধী মনোভাব ও ভারতপ্রীতির কারণেই শতকরা ৮৭ ভাগ মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ বাংলাদেশে অবিশ্বাস্য রকম দাবি তুলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আন্দোলনের হুমকি দিতে সাহস পাচ্ছে। দেশের ভেতরে বিরাট সমর্থক শক্তি আছে বলেই 'বঙ্গভূমি' আন্দোলন করার মতো ধৃষ্টতা দেখানো সম্ভব হচ্ছে। বাংলাদেশকে বিভক্ত করে দক্ষিণ-পশ্চিম অঞ্চলের ৬টি জেলা নিয়ে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র কায়েমের উদ্দেশ্যে কলকাতা থেকে এ আন্দোলন পরিচালিত হচ্ছে। ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার প্রশ্রয় না দিলে এ আন্দোলন এভাবে চলতে পারতো না। এ আন্দোলনের অন্যতম নেতা চিত্তরঞ্জন ছুতার, যিনি শেখ মুজিবের মন্ত্রিসভার সদস্য ছিলেন। এ আন্দোলনের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে কোন প্রতিবাদ করা হয়নি।

www.pathagar.com

২০০২ সালের ১৪ জুলাই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ ঢাকেশ্বরী মন্দিরে তাদের দু'দিনব্যাপী দ্বিবার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠান করে। ঐ সম্মেলনে উত্থাপিত দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো :

১. অবিলম্বে বাংলাদেশের সংবিধান থেকে রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম এবং বিসমিল্লাহর অনুচ্ছেদ বিলোপ করতে হবে।

২. বাঙালিদের নামের পূর্বে ব্যবহৃত 'আলহাজ্জ' 'মোহাম্মদ' প্রভৃতি শব্দ সাম্প্রদায়িক; সুতরাং নামের সাথে ঐসব শব্দ ব্যবহার করা যাবে না।

৩. সংবিধানের ৫ম সংশোধনী 'বিসমিল্লাহ' ও ৮ম সংশোধনী (রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম) অবিলম্বে বাতিল করে '৭২ সালের সংবিধান পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে।

৪. জাতীয় সংসদে ৮০টি আসন হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ করতে হবে।

যদি এসব দাবি পূরণ করা না হয় তাহলে হিন্দুদের অধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দক্ষিণবঙ্গের ৬টি জেলা নিয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই ৬টি জেলা হলো বরিশাল, পটুয়াখালী, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া এবং খুলনা। (দৈনিক ইনকিলাব : ২৯.১২.২০০০)

ধৃষ্টতারও একটা সীমা আছে। এসব দাবির ধরন ও দাপটময় ভাষা প্রমাণ করে যে, ঐ দাবিদাররাই এ দেশের নিয়ন্তা বলে নিজেদেরকে মনে করেন। সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনী গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করা হয়। ঐ সংশোধনীতেই বিসমিল্লাহ সংযোজন করা হয়। তারা গণভোটেরও পরওয়া করেন না। তাদের নির্দেশ গণভোটকেও অগ্রাহ্য করার ক্ষমতা রাখে। এতো বড় ধৃষ্টতা একমাত্র আওয়ামী লীগের জোরেই তারা দেখাচ্ছেন। কারণ আওয়ামী লীগ গণভোটে উৎখাত হওয়া ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকেই তাদের আদর্শ বলে ঘোষণা করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছে।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ এ নির্দেশ দেবার যোগ্যতাও রাখেন যে, মুসলমানদের নামের আগে 'মুহাম্মদ' ও 'আলহাজ্জ' ব্যবহার করা চলবে না।

তারা '৭২ সালের সংবিধান পুনঃচালু করার দাবি করেন। ঐ সংবিধান শেখ মুজিবের আমলে ৪ বার সংশোধন করা হয়। সংবিধান প্রণেতারাই সংশোধন করেন। তারা জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ছিলেন। পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের ভদ্রলোকেরা কোন্ অধিকার বলে নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের সংশোধনী বাতিল করার দাবি করেন? ৪র্থ সংশোধনীর মাধ্যমে শেখ মুজিব যখন 'মহারাজার' আসন গ্রহণ করেন তখন তারা কোথায় ছিলেন? কোন প্রতিবাদ করেছিলেন কি?

সংবিধানের অষ্টম সংশোধনী বাতিলের দাবিও তারা করেছেন। অথচ নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিগণ সংবিধান সংশোধনের নির্ধারিত বিধান অনুযায়ীই তা করেছেন। এতে আপত্তি করার অধিকার তাদেরকে কে দিলো? আওয়ামী লীগের মতো একটা বড় দল তাদের পেছনে আছে বলেই কি এতো বড় দাপট?

www.pathagar.com

সংসদে হিন্দুদের আসন সংরক্ষণের দাবি

তারা সংসদে ৮০টি আসন হিন্দুদের জন্য সংরক্ষণ করার দাবি জানিয়েছেন। তারা কি এ কথা জানেন না যে, ১৯৫৪ সালে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতিতে পূর্ব-পাকিস্তান প্রাদেশিক আইনসভায় ৩০০ আসনের মধ্যে ৭২ জন হিন্দু নির্বাচিত হন? পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু থাকলে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাতে এখন সংসদে হিন্দু প্রতিনিধি নির্বাচিত হয়ে আসতেন। ইংরেজ শাসনামলেই মুসলমানদের দাবিতে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু হয়। মুসলমানদের ভোটে মুসলমান প্রতিনিধি, হিন্দু ও অন্যান্য সম্প্রদায়ের ভোটে তাদের প্রতিনিধি নির্বাচিত হতো। ঐ পদ্ধতিতে নির্বাচন না হলে ১৯৪৬ সালে ভারতবর্ষের মুসলিম ভোটাররা পাকিস্তানের পক্ষে রায় দেবার সুযোগই পেতো না। সংখ্যালঘুরাই তাদের প্রতিনিধিত্বের অধিকার হাসিলের জন্য পৃথক নির্বাচন দাবি করে থাকে। সে হিসেবে এ প্রথা চালু থাকলে হিন্দু ভোটারদের প্রতিনিধি এখনও সংসদে বহাল থাকতো।

কাদের দাবিতে ও চাপে ১৯৫৬ সালে শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী থাকাকালে আওয়ামী লীগ সংবিধানে পৃথক নির্বাচনের বদলে যুক্ত নির্বাচন প্রবর্তন করে? প্রাদেশিক আইনসভার ৭২ জন হিন্দু সদস্যের চাপেই যে আওয়ামী লীগ এ অপকর্মটি করেছে সে কথা পূজা উদ্‌যাপন পরিষদের সদস্যরা হয় জানেন না (না জানার কথা নয়) আর না হয় জ্ঞানপাপী হিসেবে না জানার ভান করছেন। এখন কোন্ মুখে তারা হিন্দুদের জন্য আসন সংরক্ষণের দাবি তুলছেন? বাংলাদেশকে কি তারা মগের মুল্লুক পেয়েছেন? যখন যা খুশি চাইলেই দিতে হবে?

১৯৫৪ সালের নির্বাচনে ৩০০ আসনের মধ্যে ক্ষমতাসীন মুসলিম লীগ মাত্র ১০টি, হিন্দুগণ ৭২টি এবং বাকি সব আসনে যুক্তফ্রন্ট বিজয়ী হয়। যুক্তফ্রন্টে আওয়ামী মুসলিম লীগ, শেরে বাংলা ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক পার্টি ও নেযামে ইসলাম পার্টি শরীক ছিলো। নির্বাচনের পর যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হয় এবং শেরে বাংলা প্রাদেশিক প্রধানমন্ত্রী (Chief Minister) হন। কয়েকমাস পর কেন্দ্রীয় সরকার এ মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়। আওয়ামী মুসলিম লীগ যুক্তফ্রন্ট থেকে পৃথক হয়ে গেলে ৭২ জন হিন্দু সদস্যের সমর্থনে যুক্তফ্রন্ট আবার মন্ত্রিসভা গঠন করে। সংসদে তখন হিন্দু সদস্যদের হাতে 'ব্যালেন্স অব পাওয়ার'। তাদের সমর্থন ছাড়া কোন দল মন্ত্রিসভা গঠন করতে পারে না। তাই ক্ষমতায় যাবার উদ্দেশ্যে হিন্দু সদস্যদের দুয়ারে আওয়ামী লীগ মরিয়া হয়ে ধরনা দেয়।

হিন্দু সদস্যগণ তাদের সমর্থন পেতে হলে আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রতি ৩টি শর্ত আরোপ করে :

১. আওয়ামী মুসলিম লীগকে অসাম্প্রদায়িক হবার প্রয়োজনে দলের নাম থেকে 'মুসলিম' শব্দ বাদ দিতে হবে।

২. ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে দলীয় আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে।

www.pathagar.com

৩. পৃথক নির্বাচন পদ্ধতির বদলে যুক্ত নির্বাচন পদ্ধতিকে শাসনতন্ত্রে সংযোজন করতে হবে।

আদর্শহীন ও ক্ষমতালিপ্সু আওয়ামী নেতারা হিন্দুদের এসব দাবি সম্পূর্ণ মেনে নিয়ে তাদের সমর্থনে প্রাদেশিক সরকার গঠন করেন। হিন্দুরাই আওয়ামী লীগকে যুক্তনির্বাচন প্রবর্তন করতে বাধ্য করেন। অথচ আজ তারাই সংসদে আসন রিজার্ভ রাখার দাবি করছেন। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি চালু থাকলে তো বিনা দাবিতেই তারা সংসদে অনেক আসন পেয়ে যেতেন।

বাংলাদেশ পূজা উদ্‌যাপন পরিষদকে আমি পরামর্শ দিতে চাই যে, যদি সংসদে হিন্দু ভোটারদের প্রতিনিধিত্ব চান তাহলে আপনারা জোরেসোরে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি দাবি করুন। কারণ ৮০ টি আসন সংরক্ষণের দাবি তাদের রাজনৈতিক আশ্রয়দাতা আওয়ামী লীগও সমর্থন করবে না।

এখানে প্রাসঙ্গিক প্রশ্ন হলো, তারা সংখ্যালঘু হওয়া সত্ত্বেও যুক্ত নির্বাচন দাবি করলেন কেন? যুক্ত নির্বাচন চালু হওয়ার দরুনই তো সংসদে হিন্দু জনসংখ্যার প্রতিনিধিত্ব নেই। এমন আত্মহননের কাজ তারা কেন করলেন? তারা কি নির্বোধ ছিলেন? মোটেই নয়। তারা আওয়ামী নেতাদের মতো আদর্শহীন ছিলেন না। তারা এ দেশে মুসলিম জাতীয়তাকে উৎখাত করে বাঙালি জাতীয়তা কায়েম করা এবং ইসলামী আদর্শের বদলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদ প্রবর্তন করার মহান লক্ষ্যেই এ পদক্ষেপ নিয়েছেন। এতে সম্প্রদায়গতভাবে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন। তাদের এ মহান ত্যাগের ফলেই আজ বাংলাদেশে মুসলিম নামধারী ইসলামবিরোধী বিরাট শক্তির অভ্যুদয় ঘটেছে।

হিন্দু নেতারা উপলব্ধি করেছেন যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের কিছু বলা সম্ভব নয়। তাদের ভোটের জোরে যদি এমন মুসলমান নামধারীদেরকে নির্বাচিত করা যায়, যারা মুসলমানদের একাংশ ও হিন্দুদের সব ভোট পেয়ে সংসদে যাবেন, তাহলে ধর্মনিরপেক্ষতাবাদের চ্যাম্পিয়ন হওয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হবে। তাই যখন আওয়ামী নেতারা হিন্দুদের তিন দফা দাবি মেনে নিলেন তখন তারা আওয়ামী লীগকে সমর্থন দিয়ে ক্ষমতায় বসালেন। এর পর থেকে তাদের সকল সাম্প্রদায়িক ও ইসলামবিরোধী দাবি আওয়ামী লীগের মাধ্যমে পূরণ হতে থাকে এবং ১৯৫৬ সাল থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সকল নির্বাচনে হিন্দু ভোটারগণ আওয়ামী লীগের নৌকায়ই ভোট দিয়ে আসছেন। তারা আওয়ামী লীগের ভোট ব্যাংক হওয়ার মর্যাদা লাভ করেছেন।

হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার হুমকি

পূজা উদ্‌যাপন পরিষদ তাদের ঐসব অন্যায় দাবি মানা না হলে এমন এক চরম রাষ্ট্রদ্রোহীমূলক হুমকি দিয়েছেন, যা কোন সরকারের পক্ষে বরদাশ্‌ত করা স্বাভাবিক নয়। এ হুমকি যখন দেওয়া হয়, তখন শেখ হাসিনা প্রধানমন্ত্রীর পদে দাপটের সাথেই বিরাজ করছিলেন। তার দাপট সরকারবিরোধী ৪ দলীয় জোটের বিরুদ্ধে প্রচণ্ডভাবে

www.pathagar.com

তখন প্রয়োগ করা হচ্ছে; কিন্তু ঐ চরম রাষ্ট্রদ্রোহী হুমকিতে তিনি সামান্য প্রতিক্রিয়াও প্রদর্শন করেননি। এ জাতীয় হুমকি তো সরকারের বিরুদ্ধেই উচ্চারিত হয়ে থাকে। এ বিষয়ে সরকারের ঐ আজব ভূমিকা কি এ কথাই প্রমাণ করে না যে, শেখ হাসিনা তাদেরই পৃষ্ঠপোষক? যাদের পেছনে মুসলিম নামধারী নেতা-নেত্রীদের পরিচালনায় একটি বিরাট রাজনৈতিক দল রয়েছে, তারা কেন হুমকি দিতে দ্বিধা করবেন?

২০০৩ সালের ৯ জুন হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ইসলামের বিরুদ্ধে 'বাংলা দিবস' পালন করে। তাতে পরিষদের সভাপতি মেজর জেনারেল (অব.) সি আর দত্তের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে বক্তাগণ প্রচণ্ড হুমকিমূলক বক্তব্য প্রদান করেন। উক্ত সমাবেশে হাজির থেকে ঐসব বক্তব্য মুসলিম নামধারী যারা অতি উৎসাহের সাথে সমর্থন করেন তারা হলেন, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক এমপি ও ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, গণফোরামের নেতা সাইফুদ্দিন মানিক, জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু ও নূর আলম জিকু।

তাদের বক্তব্য নিয়ে জনপ্রিয় কলামিস্ট জনাব হারুনুর রশীদের একটি লেখা ১৮ জুন (২০০৩) দৈনিক ইনকিলাবে প্রকাশিত হয়। এর চেয়ে সুন্দরভাবে লেখা সম্ভব নয়। তাই তাঁর দেওয়া শিরোনামসহই লেখাটি পাঠক-পাঠিকাদের খিদমতে পেশ করলাম :

দত্তবাবুরাই কি বাঘ-সিংহ? সরকার ও দেশপ্রেমীরা কি ভীত মূষিক?

বাংলাদেশ কি সত্যিই একটি স্বাধীন-সার্বভৌম দেশ? বাংলাদেশের সংবিধান ও সাংবিধানিক আইন কি সত্যিই আদৌ কার্যকর আছে? সরকারেরও বাস্তবিকই আছে কি কোন কার্যকারিতা ও মেরুদণ্ড? আর বাংলাদেশে যারা ইসলামের কথা বলেন, তাদের মধ্যে আসলেই কি আছে কোন যথার্থ ইসলামী নিষ্ঠা ও প্রেরণা? যদি এসব প্রশ্নের উত্তর কেউ হ্যাঁ-সূচক বলে দাবি করেন, তাহলে স্বভাবতই প্রশ্ন আসে, তাই যদি হয়, তাহলে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের নেতারা একদম প্রকাশ্যে এবং স্পর্ধার সঙ্গে বাংলাদেশের সংবিধান, অখণ্ডতা ও ৮৭% মানুষের ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে দিনের পর দিন এরকম ভয়ঙ্কর বেপরোয়া হামলা চালিয়ে যেতে পারছে কিভাবে? কিভাবে তারা দিতে পারছে এরকম উদ্ধত চরম হুমকি? কিভাবে তারা নিশ্চিন্তে শাসাতে পারছে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জনকারী একটা সরকারকে? হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের নেতারা শুধু দেশ-বিদেশে বল্গাহীন প্রোপাগাণ্ডাই চালাচ্ছে না, তারা রীতিমতো প্রকাশ্য ঘোষণা দিয়েই প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিদেশী সহায়তায় বাংলাদেশের সংবিধান, অখণ্ডতা এবং ইসলামের উপর সশস্ত্র মরণ আঘাত হানার জন্য।

গত ৯ জুন এই পরিষদ ইসলামের বিরুদ্ধে 'কালো দিবস' পালন করে এবং এ উপলক্ষে আয়োজিত ও উক্ত পরিষদের সভাপতিত্বে মেজর জেনারেল সি আর দত্ত (অব.)-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাবেশে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় নিম্নলিখিত বক্তব্য প্রদান

www.pathagar.com

করে :

১. বাংলাদেশের সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' ইত্যাদি কথা এখনই বাতিল করতে হবে।

২. বাংলাদেশকে ইসলামী রাষ্ট্র বা মুসলিম রাষ্ট্র বলা যাবে না।

৩. ইসলাম এবং বিসমিল্লাহ মুছে ফেলার কাজটা বর্তমান খালেদা জিয়া সরকারকেই করতে হবে। নইলে কি করে তা করাতে হয়, সেটা এই সরকারকে দেখিয়ে দেওয়া হবে।

৪. সি আর দত্ত বলেন, "আমাদের দুর্বল ভাববেন না। বাংলাদেশে আমরা ৩ কোটি হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান রয়েছি, যা ইরাকের মোট জনসংখ্যার চেয়েও বেশি। তাছাড়া আমাদের পক্ষে রয়েছে এ দেশের অনেক মুসলমান। আমরা করতে চাইলে এ দেশে যা ইচ্ছা তাই-ই করতে পারি। আপনারা (সরকার ও মুসলমানরা) সন্তু লারমার কাছেই নতিস্বীকারে বাধ্য হয়েছেন। আমাদের সাথে পারার তো প্রশ্নই উঠে না।"

৫. এডভোকেট সুধাংশু শেখর হালদার সরকারকে হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেন, "ভারতের সাথে মিলেমিশে চলুন, অন্যথায় পরিণাম ভালো হবে না।"

৬. আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য আবদুর রাজ্জাক এমপি বিসমিল্লাহ ও রাষ্ট্রধর্ম ইসলামকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাকে হত্যার শামিল বলে অভিহিত করে বলেন, "এই সরকারকে আর সময় দেওয়া যাবে না।"

৭. গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক বলেন, "সংখ্যালঘুরা যদি এ দেশে থাকতে না পারে তাহলে সংখ্যাগুরু মুসলমানরাও এ দেশে থাকতে পারবে না। মুসলমানদেরও রেহাই দেওয়া হবে না।"

৮. বোধিপাল মহাথেরো বলেন, "বাংলাদেশে ধর্মীয় রাষ্ট্র আমরা টিকতে দেবো না।"

বলাবাহুল্য, আওয়ামী লীগ নেতা আবদুর রাজ্জাক এমপি ও ব্যারিস্টার আমীরুল ইসলাম, গণফোরাম নেতা সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক, জাসদ নেতা হাসানুল হক ইনু ও জাসদ (রব) নেতা নূরে আলম জিকু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ বিসমিল্লাহ ও ইসলামকে উৎখাত করাসহ অত্র পরিষদের সকল দাবি ও বক্তব্যের সঙ্গে দৃঢ় ও নিঃশর্ত একাত্মতা ঘোষণা করেন।

এর কিছুদিন আগে এই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদেরই ১৫তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আয়োজিত সভায়ও তারা 'বিসমিল্লাহ' ও 'ইসলাম' উৎখাতের সদর্প ঘোষণা দেন এবং বলেন :

www.pathagar.com

১. ভারত থেকে দেড় কোটি হিন্দুকে বাংলাদেশে ফিরিয়ে এনে তাদেরকে পর্যাপ্ত ক্ষতিপূরণ দিয়ে স্থায়ীভাবে বাংলাদেশে বসবাসের ব্যবস্থা করে দিতে হবে।

২. ইসলামকে বাতিল করে বাংলাদেশকে ১৯৪৭ সাল পূর্ববর্তী অবস্থায় (অর্থাৎ অখণ্ড ভারতে) ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

৩. সি আর দত্ত বলেন, "আমরা (হিন্দুরা) ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম কিংবা বাংলাদেশকে মুসলমানের দেশ বানানোর জন্য ১৯৭১ সালে ভারতের সহায়তায় মুক্তিযুদ্ধ করিনি।"

৪. তিনি আরও বলেন, "আমরা (হিন্দুরা) এদেশ স্বাধীন করে দিয়েছি বলেই ওরা (মুসলমানরা) আজ বড়লোক হবার, মন্ত্রী-সচিব ইত্যাদি হবার সুযোগ পেয়েছে। নইলে ওদেরকে (মুসলমানদেরকে) তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হিসেবেই বেঁচে থাকতে হতো।"

৫. "আমরা (হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টানরা) দুর্বল নই। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইউরোপীয় ইউনিয়ন সর্বোপরি ভারত আমাদের সরাসরি সহায়তা করছে। এ সুযোগ আমাদেরকে অবশ্যই কাজে লাগাতে হবে।"

৬. "এ দেশের হিন্দুদের আবার অস্ত্র হাতে তুলে নিতে হবে এবং আর একটি মুক্তিযুদ্ধ শুরু করতে হবে।"

বলাবাহুল্য, এই সভায়ও বিচারপতি কে এম সোবহান ও শাহরিয়ার কবিরের মতো জাঁদরেল আওয়ামী বুদ্ধিজীবীরা সশরীরে উপস্থিত হয়ে পরিষদের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের সঙ্গে পূর্ণ একাত্মতা ঘোষণা করেন।

বিচারপতি কে এম সোবহান আরও যোগ করেন, "সম্পত্তি ও নারীর লোভেই মুসলমানরা এ দেশের হিন্দুদের উপর হামলা-নির্যাতন চালাচ্ছে।"

দত্তবাবুদের উপরিউক্ত বক্তব্যসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে কিছু জিজ্ঞাসার উদ্ভব হওয়া সম্ভব। যেমন–

ক. আমরা তো জানতাম, বাংলাদেশে অমুসলিম জনসংখ্যা ১ কোটি ৩০ লাখের মতো। কিন্তু চিত্তবাবুরা দাবি করছেন, তাদের সংখ্যা তিন কোটিরও বেশি। তাহলে বাকি ১ কোটি ৭০ লাখ হিন্দু এলো কোত্থেকে? ভারত থেকে কি?

খ. দত্তবাবুরা যে বলছেন, ১৯৭১ সালে তারাই ভারতের সহায়তায় বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছেন এবং তার ফলে হাসিনা-খালেদা, জিল্লুর-মান্নান ভূঁইয়ারা আজ মন্ত্রী প্রধানমন্ত্রী হচ্ছেন (নইলে তারা তৃতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে পড়ে থাকতেন)– তাদের এই বক্তব্যের সঙ্গে শেখ হাসিনা ও আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ কি সম্পূর্ণ একমত?

www.pathagar.com

গ. দত্তবাবুরা দাবি করছেন যে, 'বিসমিল্লাহ' ও 'ইসলাম' উৎখাত এবং বাংলাদেশকে তাদের অভিলাষ অনুযায়ী ১৯৪৭ সালের পূর্ববর্তী অবস্থায় ফিরিয়ে নেওয়ার (অর্থাৎ বাংলাদেশকে ভারতের অন্তর্ভুক্ত করার) লড়াইয়ের সমর্থক অনেক মুসলমান নামধারীও রয়েছেন। এরা কারা? কী এদের পরিচয়? কোন্ রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতা এরা পাচ্ছেন।

ঘ. সাইফুদ্দিন আহমদ মানিক যে বলেছেন, সংখ্যালঘুরা এ দেশে থাকতে না পারলে মুসলমানদেরকেও এ দেশে থাকতে দেওয়া হবে না– এ কথারই বা তাৎপর্য কী? তারা কি ভারত ও অন্যদের সহায়তায় বাংলাদেশের সমস্ত মুসলমানকেও উৎখাত করার পরিকল্পনা নিয়েছেন? কিন্তু তারা যেভাবে প্রয়োজন হলেই টপ করে ভারতে চলে যেতে পারেন, ১৩ কোটি মুসলমান চলে যাওয়ার মতো সে রকম কোন দেশ তো বাংলাদেশের আশপাশে নেই। সেক্ষেত্রে মুসলমানদেরকে পাইকারি হত্যার মাধ্যমেই কি তারা বাংলাদেশকে মুসলমানশূন্য করবেন?

ঙ. সুধাংশু বাবু যে সরকারকে নির্দেশ দিলেন ভারতের সঙ্গে মিলেমিশে চলতে এবং হুমকি দিলেন অন্যথায় এর পরিণাম ভালো হবে না– এ কথারই বা তাৎপর্য কী? এর তাৎপর্য কি এই যে, ভারত চাহিবামাত্র বাংলাদেশকে গ্যাস, করিডোর ইত্যাদি দিয়ে দিতে হবে? সীমান্ত থেকে বিডিআর তুলে নিতে হবে, যাতে ভারতীয়রা ইচ্ছামতো এ দেশে ঢুকতে পারে, এ দেশের যে কোন এলাকা দখল করে নিতে পারে, এখানকার যে কোন মানুষকে হত্যা করতে পারে এবং ভারতীয় নিম্নমানের পণ্য ডাম্প করে এ দেশের সমস্ত শিল্প-কারখানা বন্ধ করে দিতে ও ব্যবসা-বাণিজ্য দখল করে নিতে পারে? অন্যথায় পরিণাম ভালো হবে না–কথাটার অর্থ কি এই যে, বেগম খালেদা জিয়া সরকার তাদের নির্দেশ মতো কাজ না করলে তারা ভারতের সহায়তায় এই সরকারকে যে কোন মুহূর্তে উৎখাত করে এ দেশে ভারতের একটা পুতুল সরকারই বসিয়ে দেবেন? শেখ হাসিনাই কি সেই সরকারের প্রধান হবেন?

চ. দত্তবাবুরা যে বারংবার অস্ত্র হাতে নিয়ে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের হুমকি দিচ্ছেন, তাদের অস্ত্রের সরবরাহটা আসছে কোত্থেকে? উল্লেখ্য, ইতঃপূর্বে তারা একথাও একদম প্রকাশ্যে বলেছেন যে, মুসলমানদের রক্তে পদযুগল রঞ্জিত না করলে তাদের কালীমাতা পরিতৃপ্ত হবেন না। তাহলে ১৩ কোটি মুসলমানের রক্তে কি তারা রঞ্জিত করতে চান তাদের কালীমাতার শ্রীচরণ?

খবরে প্রকাশ, ভারত ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায় বাংলাদেশের মুসলমানদের উপর একটি ব্যাপক হত্যাযজ্ঞ চাপিয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে একটি ভয়ঙ্কর নীলনকশা ইতোমধ্যেই প্রণীত হয়েছে এবং শুরু হয়েছে সর্বাত্মক আন্তর্জাতিক প্রোপাগাণ্ডা। এই লক্ষ্যে যুক্তরাষ্ট্রে গঠন করা হয়েছে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদেরই আর এক অঙ্গসংগঠন 'হিউম্যান রাইটস্ কংগ্রেস ফর বাংলাদেশ' (এইচআরসিবি) এবং এর কেন্দ্রীয় সমন্বয়কারী হচ্ছেন

www.pathagar.com

জনৈক ধীমান চৌধুরী। বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতনের কাহিনী বানানোর মূল দায়িত্বে রয়েছেন সুপ্রীম কোর্টের এক এডভোকেট রবীন্দ্র ঘোষ। রবীন্দ্র ঘোষ এই লক্ষ্যে গঠন করেছেন 'সাধনা সংসদ' নামে একটি সংগঠন এবং বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে তুলছেন 'আশ্রম'। এরা কাজ করবেন ব্রিটিশ আমলে সৃষ্ট উগ্র হিন্দুত্ববাদী, কালীসাধক সন্ত্রাসী সংগঠন 'অনুশীলন সমিতি' ও 'যুগান্তর'-এর কায়দায়। ধীমান চৌধুরীরা 'হিউম্যান রাইটস্ ট্রিবিউন' নামে একটি পত্রিকাও প্রকাশ করেছেন। এর সম্পাদকমণ্ডলীর ১২ জনের মধ্যে একজন মুসলমানকেও রাখা হয়নি। তবে রবীন্দ্র ঘোষরা সালাম, আজাদদেরকে নাকি ব্যবহার করে থাকেন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সভা-সমিতিতে ভাষণ-বক্তৃতা দেওয়ার জন্য। কারণ একজন মুসলমান নামধারী বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের গল্প বললে তা নাকি বিদেশীদের কাছে অধিক বিশ্বাসযোগ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়। তবে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ, সাধনা সংসদ ইত্যাদি মৌলিক সংগঠনে মুসলমান নামধারী কাউকে রাখা না হলেও হিন্দুত্ববাদের অন্ধ স্তাবক মুসলমান নামধারীদেরও কায়দামতো ব্যবহার করার উদ্দেশ্যে সম্প্রতি নিউইয়র্কে গঠিত হয়েছে, 'বাংলাদেশ সেক্যুলার ফোরাম' নামে হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের আর একটি অঙ্গসংগঠন। এই পরিষদের আহ্বায়ক নির্বাচিত হয়েছেন, 'জাতির পিতার স্বপ্ন বাস্তবায়ন পরিষদ'-এর সেক্রেটারি সুভাষ মজুমদার। এর অন্যান্য নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন, বাসদ যুক্তরাষ্ট্র শাখার নেতা তপন জামান, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের নেতা সুকুমার রায় ও শ্যামল চক্রবর্তী প্রমুখ। বলাবাহুল্য, এই ফোরামটিও সম্পূর্ণভাবেই হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদেরই নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তবে এই পরিষদে তাদের একান্ত বংশবদ কিছুসংখ্যক মুসলমান নামধারীও থাকতে পারবেন।

এদিকে গত ১১ জুন (২০০৩) ভারতের গোঁড়া হিন্দুত্ববাদী সংগঠন 'বিশ্ব হিন্দু পরিষদ' (ভিএইচপি) নেতা প্রবীণ ভাই তোগাড়িয়া আসামের গৌহাটিতে অনুষ্ঠিত এক জনসভায় দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেছেন, "ভারতের উচিত অবিলম্বে বাংলাদেশ আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া।" তার মতে, বাংলাদেশী মুসলমানে আসাম ছেয়ে গেছে এবং ভারতের উচিত শক্তিপ্রয়োগের মাধ্যমে এদেরকে বাংলাদেশে ফেরত পাঠানো। তোগাড়িয়া এ ব্যাপারে তার দলের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে বলেছেন, "যদি ভারত সরকার এ ব্যাপারে পদক্ষেপ না নেয়, তাহলে বিশ্ব হিন্দু পরিষদই আসামে আগুন জ্বালিয়ে দিয়ে এসব অবৈধ বাঙালি মুসলমানদের উচ্ছেদ করে দেবে।"

বলাবাহুল্য, বিজেপি, বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং, শিবসেনাসহ ভারতের প্রতিটি হিন্দুত্ববাদী সংগঠনই ভারত থেকে মুসলমানদের সম্পূর্ণ নির্মূলীকরণ, বিশ্বের অন্তত উপমহাদেশের অনৈসলামিকীকরণ, বাংলাদেশকে মুসলিম শূন্যকরণ, উপমহাদেশে নিরঙ্কুশ হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠা এবং গোঁড়া হিন্দুত্বভিত্তিক বৃহত্তর ভারত কায়েমের ব্যাপারে সম্পূর্ণ একমত। এদের সর্বাত্মক সহায়তা, মদদ ও পৃষ্ঠপোষকতা রয়েছে বাংলাদেশের হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদের কর্মকাণ্ডের প্রতি।

www.pathagar.com

কিন্তু ভয়ঙ্কর মুসলিম-বিদ্বেষী ও উগ্র হিন্দুত্ববাদী এই পরিষদে বৌদ্ধ ও খ্রিস্টানরা কি যুক্তিতে রয়েছেন, সেটাই এক বিস্ময়। তারা কি সুনিশ্চিত যে, হিন্দুত্ববাদ কায়েম হলে তাদের শান্তি ও সুখ-সমৃদ্ধি বহুগুণ বৃদ্ধি পাবে?

আওয়ামী লীগ-এর নেতা ও বুদ্ধিজীবীরা প্রতিনিয়তই সশরীরে উপস্থিত হয়ে ইসলাম ও বিসমিল্লাহ নির্মূলীকরণ ও ১৩ কোটি মুসলমানদের বিরুদ্ধে হিন্দুদের সশস্ত্র লড়াইসহ প্রতিটি ইস্যুতে নিঃশর্ত ও নিরঙ্কুশ সমর্থন দিয়ে এসেছেন। এর কারণ সম্ভবত এই যে, আওয়ামী লীগাররা বিশ্বাস করেন, এই প্রক্রিয়াতেই তারা হিন্দুদের একচ্ছত্র সমর্থন ও ভোট পেয়ে যেতে থাকবেন এবং এই প্রক্রিয়াতেই তারা সমর্থ হবেন ভারত ও হিন্দুদের সহায়তায় বারংবার বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে। অনেকের মতেই নাকি এর সঙ্গে বিপুল অর্থপ্রাপ্তিরও কারকতা রয়েছে। আর যদি বাংলাদেশ ভারতের একটা বশংবদ করদরাজ্যে পরিণত হয়, তাহলে তারা নাকি আরো বেশি আনন্দিত হবেন এজন্য যে, এরূপ রাজ্যে তারা ব্যতীত ইসলামপন্থি বা বাংলাদেশী জাতীয়বাদী কারো অবস্থান বা অস্তিত্বের কোন সম্ভাবনাই আর থাকবে না। এদের আচরণে আসলে বিস্ময়ের কিছুই নেই; কিন্তু প্রচণ্ড বিস্ময় জাগে ক্ষমতাসীন ৪ দলীয় সরকার, খোদ বিএনপি এবং বিভিন্ন ইসলামী দল, সংগঠন ও নেতৃত্বের আচরণ ও অবস্থান দেখে। সরকার দত্তবাবুদের ও তাদের দালালদের সশস্ত্র লড়াই ও সরকার উৎখাতের হুমকিসহ যাবতীয় রাষ্ট্রবিরোধী ও আইনবিরোধী স্পর্ধাকে নীরবে হজম করেছেন কিসের জন্য? সরকার ও সরকারের মিত্র সংগঠনসমূহও কি তাহলে এই ভয়ে ভীত-সন্ত্রস্ত যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ ও তাদের মুসলিম নামধারী এজেন্টদের গায়ে হাত দিলেই এরা ভারতের সহায়তায় যে কোন মুহূর্তে জোট সরকারকে উৎখাত করে দেবে? আর এদের ভজনা করলেই ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা তুষ্ট থাকবে এবং নির্বাচনে বিএনপি বা তাদের জোট জিতলেও তেমন একটা ওজর-আপত্তি করবে না? বাংলাদেশ ও বাংলাদেশের ১৩ কোটি মুসলমানের পরিণতি যা হবে হোক, এদের তুষ্ট রেখে যতদিন ক্ষমতায় টিকে থাকা যায়, সেটাই লাভ– এই-ই কি তাহলে এদের লজিক? কিন্তু দেশে-বিদেশে হিন্দুত্ববাদী ও তাদের এজেন্টদের বাড় যেভাবে বাড়ছে, তাতে বিএনপি জোট (যোগাযোগমন্ত্রীর দাবি অনুযায়ী) আগামী ২৫ বছর যাবৎ বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় টিকে থাকবেন, এ ব্যাপারেও কি তারা খুবই সুনিশ্চিত? তাদের এই মোহ একদিন খুবই নির্মমভাবে ভেঙে যাবে না তো?

আর ইসলামপন্থি বা ইসলামের পাবন্দির দাবিদারদের হাল আচরণটা কুরআন-সুন্নাহ এবং রাসূল (স) ও সাহাবায়ে কেরামের (রা) সংগ্রামী জীবনের দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই বিস্ময়কর মনে হলেও, তাদের সাম্প্রতিক অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গির বিচারে সেটা তেমন একটা বিস্ময়কর মনে হবার কথা নয়। কারণ এদের বাস্তব কর্মকাণ্ড থেকে এটা সকলেই হয়তো দেখে থাকবেন যে, সাম্রাজ্যবাদী ইহুদীবাদী-হিন্দুত্ববাদীরা ইসলাম ও

www.pathagar.com

মুসলমানদের উপর যত আঘাতই হানুক না কেন এবং সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতি ও জীবনবোধের যতই অনৈসলামিকীকরণই ঘটাক না কেন, ইসলামপন্থি ও ইসলামের একান্ত পাবন্দির দাবিদারদের দৃষ্টিতে এসব ইসলাম বিধ্বংসী সাম্রাজ্যবাদী-ইহুদীবাদী-হিন্দুত্ববাদী বা তাদের দেশীয় দালালদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়া ও রুখে দাঁড়ানো আদৌ কোন জরুরি ব্যাপার নয়। একমাত্র জরুরি ব্যাপার হলো, নিজেরা ৪ শতাধিক রাজনৈতিক-আধা-রাজনৈতিক সংগঠনসহ কয়েক শত দল, মাযহাব ও ফিরকাহগত ঘরানায় বিভক্ত থাকা, ফিরকাহ-মাযহাব-পীরানা-ঘরানাগত দ্বন্দ্ব-বাহাসে সদা মশগুল থাকা এবং সবাই আল্লাহ, আল্লাহর রাসূল (স) ও কিতাবে বিশ্বাস করা সত্ত্বেও পরস্পর পরস্পরকে কাফের, মুরতাদ, ফাসেক, জাহেল, বাতেল, গাফেল ইত্যাদি বলে অভিহিত করা। যেসব বিধর্মী ইসলামে বা কুরআন-সুন্নাহে আদৌ বিশ্বাস করেন না বরং ইসলামকে নির্মূল করতেই তারা বদ্ধপরিকর, তারা বাংলাদেশের ইসলামপন্থি বা ইসলামের একনিষ্ঠ পাবন্দির দাবিদারদের আঘাতের প্রধান লক্ষ্যবস্তু নন, এদের আঘাতের প্রধান লক্ষ্যবস্তু হলো, কালেমা-নামায-রোযা-হজ্জ-যাকাত আদায়কারী সেসব মুসলমান যাদের সঙ্গে এদের ইজতিহাদগত বা দলগত বা পীরানা-ঘরানাগত মতের কিঞ্চিৎ ভিন্নতা আছে।

অথচ দেখুন, ভারতের কোন মুসলমান বা মুসলিম সংগঠন যদি এখানকার দত্তবাবুদের কায়দায় ভারতের হিন্দুদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র লড়াইয়ের ঘোষণা দিতো, হিন্দু ও হিন্দুত্ববাদের বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে এ রকম প্রোপাগাণ্ডার তাণ্ডব চালাতো এবং ভারতের মাটিতে বসেই কোনে বিদেশী রাষ্ট্রকে ভারতে আক্রমণের জন্য আহ্বান জানাতো, তাহলে সেই মুসলমানের বা মুসলমানদের পরিণামটা কি দাঁড়াতো? সেক্ষেত্রে বিশ্ব হিন্দুপরিষদ, বিজেপি, বজরং, আরএসএস, শিবসেনাসহ সমস্ত হিন্দুবাদী সংগঠন, এমনকি তথাকথিত সেক্যুলার সংগঠনের অনেকেও কি মুক্ত খড়গ-কৃপাণ-ত্রিশূল নিয়ে ওইসব মুসলমানদের প্রকাশ্যে হত্যা করতো না? ঠিক এ ধরনের স্পর্ধা প্রকাশ করলে, তারা কি ভারতের সমস্ত মুসলমানকে হত্যা বা নির্মূল করার আগে কখনোই থামতো? ভারত সরকার ও ভারতের পুলিশও কি সেক্ষেত্রে মুসলিম নিধনকারী হিন্দুত্ববাদীদের সর্বাত্মক সমর্থন ও সহায়তা দিতো না, যেমন দিয়েছিলো গুজরাটে পাইকারি ও একতরফা মুসলিম হত্যাযজ্ঞের ক্ষেত্রে?

অথচ, এতো অত্যাচার, নিপীড়ন ও গণহত্যা সত্ত্বেও ভারতের মুসলমানরা যা করাতো দূরের কথা, বলার চিন্তারও সাহস পায় না, তাই-ই এখানকার দত্তবাবুরা এবং তাদের মুসলিম নামধারী বংশবদরা অবলীলায় করে যেতে পারছে কিসের জন্য? তারা তা পারছে এ জন্য যে, দত্তবাবুরা হয়তো বিশ্বাস করেন যে, তাবৎ আওয়ামী লীগাররাই যেহেতু তাদের উপর এবং তাদের মূল শক্তি ভারতের উপর ১০০% নির্ভরশীল, সেহেতু তারা তাদের যে কোন কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা তো দূরের কথা; বরং তাদের প্রতি নিঃশর্ত সমর্থন

www.pathagar.com

ও আনুগত্য প্রকাশ করতেই বাধ্য (যা আওয়ামী নেতারা নাকি সর্বদা করেছেনও)। দত্তবাবুরা হয়তো এটাও মনে করে থাকতে পারে যে, বিএনপি ও তার মিত্ররাও তাদের কর্মকাণ্ডে কোনরূপ বাধা সৃষ্টির সাহস পাবে না এই ভয়ে যে, তাদের গায়ে হাত দিলেই তাদের মূল শক্তি ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা এই সরকারকে চরমভাবে দেখে নেবে।

আর সর্বোপরি, চিত্তবাবুরা এবং তাদের মুসলিম নামধারী অনুচররা এটা সুনিশ্চিতভাবেই জানেন যে, এখানকার ইসলামী নেতা-ক্যাডার, আলেম-আল্লামা, পীর-মাশায়েখ প্রমুখ নিজেদের পারস্পরিক ব্যাপারে যত জযবাই দেখান না কেন, চিত্তবাবুরা তো বহু দূরের কথা, চিত্তবাবুদের মুসলিম নামধারী কোন এজেন্টের একটি লোম স্পর্শ করার কোন সাহস বা ক্ষমতাও এদের কখনোই হবে না। হিন্দুত্ব বা ভারতের স্বকীয়তা ও স্বার্থ রক্ষার জন্য শতধা বিভক্ত হিন্দুত্ববাদী ও আধা-হিন্দুত্ববাদী সংগঠন এবং সাধুসন্ত সন্ন্যাসীরা যেভাবে খড়গ-কৃপাণ-ত্রিশূল ও আগ্নেয়াস্ত্র হাতে নিয়ে প্রকাশ্যে তাড়া করে মুসলমানদের হত্যা ও হিন্দুত্ব রক্ষায় ঝাঁপিয়ে পড়তে পারেন, সে রকম সাহস তো দূরের কথা (এবং মুসলমানরা করবেও না কোন দিন) ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ার চেতনাটুকুও বাংলাদেশের ইসলামী নেতৃত্বের আছে বলে বিশ্বাস করেন না হিন্দুত্ববাদীরা এবং তাদের দালালরা। অতএব, বাংলাদেশে হিন্দুত্ববাদী ও তাদের দালালদের যে কোন পরিমাণ উদ্ধত হতে এবং যা খুশি তাই করতে বাধা কোথায়? কেন তারা তা করবেন না।

যারা সশস্ত্র হামলা চালিয়ে ৮৭% মুসলমানকে হত্যার প্রকাশ্য হুমকি দিচ্ছে, যারা ভারতের প্রতি প্রকাশ্য আহ্বান জানাচ্ছে বাংলাদেশ আক্রমণ করে তা দখল করে নেওয়ার জন্য, যারা বাংলাদেশের একটা অংশ ছিনিয়ে নিয়ে আলাদা রাষ্ট্র গঠনের প্রকাশ্য তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে, যারা ক্ষমতাসীন সরকারকে দেখিয়ে দেওয়ার উদ্ধত হুমকি দিচ্ছে, যারা মুসলমানের রক্তে কালীমাতার পদযুগল রঞ্জিত করার খোলাখুলি অঙ্গীকার ঘোষণা করছে এবং যারা 'বিসমিল্লাহ' ও 'ইসলাম'কে উৎখাত করার জন্য মরিয়া হয়ে মেতে উঠেছে, তাদের এ সমস্ত কর্মকাণ্ড কি রাষ্ট্রদ্রোহিতা ও সংবিধানদ্রোহিতার পর্যায়ে পড়ে না? যদি পড়ে তাহলে আইনের দীর্ঘহস্ত কেন এদের পাকড়াও করতে পারছে না? কোথায় সরকারের অপারগতা? এই যে সরকার, সরকারি দলসমূহ, অন্যান্য রাজনৈতিক দল, বিভিন্ন ইসলামী সংগঠন, পীর-মাশায়েখ ও আলেম-আল্লামারা দত্তবাবুদের এবং তাদের মুসলিম নামধারী দালালদের ভয়ে সিঁটিয়ে আছেন, তাতে কি বাংলাদেশের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব, অখণ্ডতা বা ইসলামের কোনই সুরক্ষা হবে শেষ পর্যন্ত? সরকার যতই পিঠে কুলো আর কানে তুলো গুঁজে বসে থাকুক না কেন, তাতে দত্তবাবুরা ও তাদের এজেন্টরা কি মত বদলাবেন? তারা কি তাদের আপন দলকে বাদ দিয়ে বিএনপি জোটকে কখনো কোন অবস্থাতেই ক্ষমতায় রাখতে চাইবেন? আর ধর্মনিরপেক্ষতাবাদীরা আবার ক্ষমতায় যেতে পারলে ইসলামী নেতা-আলেম-পীর প্রমুখরাও কি রেহাই পাবেন?

www.pathagar.com

ভারতের কোন মুসলমান চিত্তবাবুদের সমকক্ষ রাষ্ট্রদ্রোহিতা, সংবিধানদ্রোহিতা ও হিন্দুত্বদ্রোহিতা করলে ভারতে সরকার, ভারতের আইন এবং ভারতের হিন্দুত্ববাদীরা সেই মুসলমানদের প্রতি কি আচরণ করতো, তাও কি আমলে নেবেন না ৪ দলীয় জোট সরকার, জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক নেতৃত্ব, দেশপ্রেমিক ও যুক্তিশীল বুদ্ধিজীবীরা এবং বাংলাদেশের ইসলামী, আমল, আখলাক, শরীআত, তরীকাত ও মারিফাতের দাবিদাররা?

যত তেজ, যত চোটপাট সব বুঝি যার যার গর্তের ভেতরেই? ঘরের বউ, অধস্তন চাকর-কর্মচারি, ব্যক্তিত্বহীন ভক্ত-অনুসারী আর নিরীহ-অসহায় মানুষের উপরই?

আর একটি মুক্তিযুদ্ধের ডাক

আওয়ামী লীগ ও জাসদ নেতাদের এবং এ বলয়ের বুদ্ধিজীবীদের মুখে বহুদিন থেকেই আর একটি মুক্তিযুদ্ধের প্রয়োজন বলে বার বার ঘোষণা করা হচ্ছে। '৭১-এ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর দখল থেকে মুক্তির উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করা হয়, কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশকে কারো হাত থেকে মুক্ত করার জন্য আরও একটি মুক্তিযুদ্ধ প্রয়োজন তা ঐ মহল ছাড়া আর কারো বোধগম্য হবার কথা নয়।

বাংলাদেশ বর্তমানে ১৪ কোটি জনগণের মযবুত দখলে রয়েছে। কোন ক্ষমতাসীন দলের সাধ্য নেই যে, মেয়াদের অতিরিক্ত একদিনও ক্ষমতা আঁকড়ে থাকতে পারে। শেখ হাসিনাকেও গদি ছাড়তে হয়েছে। ২০০৬ সালে বেগম খালেদা জিয়াকেও ক্ষমতা থেকে সরে যেতে হবে। আবার একটি কেয়ারটেকার সরকারের পরিচালনায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। জনগণ তাদের রায় অবাধে দেবার সুযোগ পাবে এবং তারা যাদেরকেই ক্ষমতায় বসাতে চায় তারা ছাড়া আর কারো গদি দখলের কোন সুযোগ নেই। তাই নিঃসন্দেহে দেশ বর্তমান নিরঙ্কুশভাবেই জনগণের দখলে। যারা মুক্তিযুদ্ধের ডাক দিচ্ছেন তাদের একথা মোটেই অজানা নয়।

তাহলে স্পষ্টই বুঝা গেলো, তারা জনগণের দখল থেকে দেশকে মুক্ত করার জন্যই যুদ্ধ করতে চান। প্রশ্ন হলো তারা দেশটাকে কাদের দখলে দেবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ করার হুমকি দিচ্ছেন? '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের তিক্ত অভিজ্ঞতা জনগণের হয়েছে। ঐ মুক্তিযুদ্ধের রাজনৈতিক নেতৃত্ব আওয়ামী লীগ দিলেও ময়দানে কারা যুদ্ধ করেছে? সবাই জানে যে, পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংলাদেশী অফিসার ও জোয়ানদের যারা পূর্ব-পাকিস্তানে কর্মরত ছিলেন তারা এবং বিডিআর ও পুলিশ বাহিনীর বিদ্রোহীরাই সেনা অফিসারদের নেতৃত্বে পাকিস্তানি বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন। তাদেরই নেতৃত্বে মুক্তিপাগল যুবক-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়। ইসলামপন্থি দল ছাড়া অন্যান্য বহু রাজনৈতিক নেতা ও দল ঐ যুদ্ধে সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর আওয়ামী লীগ একচেটিয়াভাবে দেশকে দখল করে নেয়। চতুর্থ বছরে এসে তো শেখ মুজিব তার বশংবদ দলের

www.pathagar.com

সম্মতি নিয়ে গোটা সরকারি ক্ষমতা তার একক দখলে নিয়ে নেন। সেনাবাহিনীতে যারা মুক্তিযোদ্ধা ছিলেন তারাই শেখ মুজিবের গোলামি থেকে '৭৫-এর ১৫ আগস্ট জনগণকে উদ্ধার করেন। তারই পরিণতিতে আজ দেশের দখলিস্বত্ব জনগণ ভোগ করছে।

যারা এখন মুক্তিযুদ্ধের হুমকি দিচ্ছেন তারা কি তাহলে জনগণ থেকে দখলিস্বত্ব কেড়ে নিয়ে আবার শেখ মুজিবের কন্যার হাতে তুলে দেবার ষড়যন্ত্রে মেতেছেন? জনগণ তাঁকে ক্ষমতায় বসায়নি বলে ভিন্ন কৌশলে ক্ষমতা দখলের পাঁয়তারা চলছে। আওয়ামী লীগ '৭১ সালে স্বাধীনতা সংগ্রামের যে রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে তা শতকরা একশ' ভাগ ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায়। আওয়ামী লীগের বর্তমান অসাংবিধানিক ও অগণতান্ত্রিক আন্দোলনেও ভারতের পৃষ্ঠপোষকতার প্রমাণ যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে।

কিন্তু আওয়ামী লীগের কপাল খারাপ বলে '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের সময় ময়দানে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, বর্তমান ঐ সেনাবাহিনী ও তাদের সহযোগী বিডিআর ও পুলিশ তাদের কুমতলবের নতুন মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী। কারণ তারা জানে যে দেশের ক্ষমতা এখন সম্পূর্ণরূপে জনগণের হাতে। বিশেষ করে প্রতিরক্ষার দায়িত্বে নিয়োজিত সশস্ত্র বাহিনী মনস্তাত্ত্বিকভাবেই ভারতবিরোধী। সীমান্ত প্রহরী বিডিআরও তাই। আওয়ামী লীগের ষড়যন্ত্রে শরীক হয়ে বাংলাদেশকে দিল্লির হাতে তুলে দেবার জন্য তারা কিছুতেই সম্মত হতে পারে না।

সশস্ত্রবাহিনী ও বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস) প্রধানত প্রতিরক্ষার দায়িত্ব পালন করে থাকে। তাদেরকে ট্রেনিং দেবার সময় দেশ-রক্ষার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনে জান দেবার জন্যও উদ্বুদ্ধ করা হয়। প্রতিরক্ষা (Defence) বললেই বুঝায় আক্রমণকারী থেকে আত্মরক্ষা করা বা হামলা প্রতিরোধ করা। মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে তাদেরকে বিরোধীশক্তির মোকাবিলার জন্যই গড়ে তোলা হয়। Defence বললেই প্রশ্ন উঠে Defence against whom? কার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ বা প্রতিরক্ষা?

বাংলাদেশের চারপাশে যদি ৪/৫টি রাষ্ট্র থাকতো তাহলে ঐ প্রশ্নের জওয়াব হতো, "যে দেশ থেকেই আক্রমণ হোক সে দেশের বিরুদ্ধেই প্রতিরোধ।" ঘটনাক্রমে বাংলাদেশ একটি রাষ্ট্র দ্বারাই প্রায় চারদিকে ঘেরাও হয়ে আছে এবং যদি কখনও বিদেশী শক্তি এ দেশে হামলা করে, তাহলে তা যে একমাত্র ভারত– এ বিষয়ে কোন মতভেদ নেই। তাই বাংলাদেশের সকল সশস্ত্রবাহিনীই মনস্তাত্ত্বিক দিক দিয়ে ভারত-বিরোধী। তারা ভারতকে বন্ধু মনে করতে অভ্যস্ত নয়। যদি ভারত এ দেশের প্রতি বৈরী আচরণ অব্যাহত না রাখতো তাহলে ভারতকে তারা বড়জোর সৎ প্রতিবেশী মনে করতো।

এ কারণেই যারা ভারতের অব্যাহত বৈরী আচরণ সত্ত্বেও সেদেশকে গৌরবের সাথে বন্ধুদেশ বলে ঘোষণা করে এবং তাদের কোন অন্যায় আচরণে সামান্য আপত্তিও করে

www.pathagar.com

না তাদেরকে এ দেশের প্রতিরক্ষাবাহিনী দেশপ্রেমিক হিসেবে শ্রদ্ধা করতে পারে না। সাবেক সেনাপতি লে. জেনারেল নাসিম ও লে. জেনারেল মুস্তাফিজুর রহমান ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় অবাঞ্ছিত ঘোষিত হয়েছেন বলে গোটা সশস্ত্র বাহিনী উল্লসিত। কারণ তাদেরকে ভারতপন্থি বলে ধারণা করা হয়।

আর একটি মুক্তিযুদ্ধ কাদের নেতৃত্বে সংঘটিত হবে?

১৯৭১ সালে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর বাংলাদেশী বিদ্রোহীদের নেতৃত্বে বিদ্রোহী বিডিআর ও পুলিশ এবং দেশপ্রেমিক মুক্তিপাগল কিশোর-যুবকরা জীবনপণ করে মুক্তিযুদ্ধ করেছে। আওয়ামী লীগ নেতারা তো ময়দানে যুদ্ধ করেননি। এখন বাংলাদেশের সশস্ত্রবাহিনী আওয়ামী লীগের ডাকে কি আর একটি মুক্তিযুদ্ধে শরীক হবে বলে তারা মনে করেন? তাহলে ময়দানে এ যুদ্ধের নেতৃত্ব কাদের হাতে থাকবে?

'৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের পেছনে ভারতের শুধু পৃষ্ঠপোষকতাই নয়, ভারত সরকারের রাজনৈতিক, কূটনৈতিক, এমনকি সামরিক প্রত্যক্ষ সক্রিয় ভূমিকা ছিলো। ভারতের বর্তমান কংগ্রেস কোয়ালিশন সরকারের নেতৃবৃন্দের সাথে গত জুলাই (২০০৪) মাসে সাক্ষাৎ করে শেখ হাসিনা এ বিষয়ে কোন নিশ্চয়তা পেয়েছেন কিনা জানি না, তবে বাংলাদেশের উপর হামলা করার জন্য ভারত সরকারকে উৎসাহিত করার মতো কিছু তথ্য দিয়ে আসতে পারেন। যেমন ঃ

১. বাংলাদেশে ভারতের পূর্বাঞ্চলের বিদ্রোহীদের ঘাঁটি আছে কিনা এ প্রশ্নের জওয়াবে তিনি পরোক্ষভাবে এ বিষয়ে ভারতের মিথ্যা অভিযোগকে সত্য বলে স্বীকৃতি দিয়ে এসেছেন।
২. বাংলাদেশে বর্তমানে মৌলবাদী তালেবান শক্তি ক্ষমতাসীন বলে সাক্ষ্য দিয়ে এলেন।
৩. বাংলাদেশে হিন্দুদের উপর চরম নির্যাতন চলছে বলে ভারতের নিকট এর প্রতিকার নিশ্চয়ই চেয়েছেন।

২য় ও ৩য় অপবাদ তিনি ২০০১ সালে নির্বাচনের পরই আমেরিকায় ব্যাপকভাবে প্রচার করে এসেছেন। বর্তমান হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্যপরিষদ তার পক্ষ থেকে এ মহান দায়িত্ব সেখানে পালন করছে। তাই এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, এ দুটো মোক্ষম অপবাদ দিল্লিতে অবশ্যই আসল জায়গায় পৌঁছিয়ে দিয়েছেন।

স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ

আওয়ামী লীগ বলয়ের লোকেরা দেশ স্বাধীন হবার কয়েক দশক অতিক্রম করার পরও স্বাধীনতা আন্দোলনে তাদের একচ্ছত্র কৃতিত্ব জাহির করার উদ্দেশ্যে স্বাধীনতার পক্ষশক্তিকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে স্বাধীনতাবিরোধীদের মোকাবিলা করার আহ্বান জানাতে ক্লান্তিবোধ করেন না।

www.pathagar.com

১৯৭২ থেকে '৭৫ সাল পর্যন্ত শেখ মুজিবের কুশাসন ও স্বৈর শাসন, ১৯৯৬ থেকে ২০০১ পর্যন্ত শেখ হাসিনার অপশাসন এবং ২০০১ সালের নির্বাচনের পর থেকে শেখ হাসিনার সংবিধান ও গণতন্ত্রর বিরোধী রাজনীতির তিক্ত অভিজ্ঞতার পর জনগণ তাদেরকে স্বাধীনতার রক্ষক বলে মনে করে কিনা তা এখনও তারা যাচাই করতে পারেননি। বিশেষ করে তাদের অন্ধ ভারত-প্রেমের নগ্ন প্রমাণ পাওয়ার কারণে '৭৫-এর পর থেকে জনগণ তাদেরকে ক্ষমতায় দেখতে চায়নি। '৯৬ সালে পরীক্ষামূলকভাবে ক্ষমতায় বসিয়ে নতুন করে দেশবাসী তাদেরকে চিনে নিয়েছে। ২০০১ সালের নির্বাচনের ফলাফল থেকে তারা এ শিক্ষা গ্রহণ করতে ব্যর্থ হয়েছেন।

দেশবাসীর এ কথা বুঝতে আর বাকি নেই যে, তারা বর্তমানে যে আজব রাজনীতি করছেন এর পরিণাম বাংলাদেশে ভারতের পূর্ণ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা। বাংলাদেশের নিকট ভারত যেসব অন্যায় দাবি করছে সে বিষয়ে আর সবাই আপত্তি করলেও তারা কোন সময়ই আপত্তি করেন না কেন?

ভারত চায় বাংলাদেশের চারপাশের রাজ্যসমূহে যারা দিল্লি সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করছে তাদেরকে দমন করার জন্য বাংলাদেশের জলপথ ও স্থলপথকে ব্যবহার করতে দিতে হবে। চট্টগ্রাম বন্দর তাদেরকে ব্যবহার করার সুযোগ দিতে হবে। গ্যাস তাদের নিকট বিক্রয় করতে হবে। এসব দাবি বাংলাদেশের স্বার্থের সম্পূর্ণ বিরোধী। তাদের প্রথম দাবিটি মেনে নিলে দেশের স্বাধীনতাই বিপন্ন হয়ে পড়বে। এ অবস্থায় কারা স্বাধীনতার পক্ষে, আর কারা বিপক্ষে সে কথা বুঝবার যোগ্যতা জনগণের আছে।

বাংলাদেশে 'র'-এর সক্রিয় ভূমিকা

ভারতের কুখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা 'র' (RAW—Research and Analysis Wing) সম্পর্কে এটুকু ধারণা শিক্ষিত মহলে ব্যাপকই আছে যে, ভারতের সব রকম স্বার্থ হাসিল করার উদ্দেশ্যে এ সংস্থা বাংলাদেশে অত্যন্ত সক্রিয়। এ বিষয়ে আমি দুটো প্রামাণ্য গ্রন্থ পেয়েছি।

একটি হলো ভারতীয় সাংবাদিক অশোকা রায়নার লেখা "Inside Raw" বাংলায় এর অনুবাদ করেছেন লে. (অব) আবু রুশদ। আমি এ অনুবাদ গ্রন্থটি থেকে কোন তথ্য পরিবেশন করা প্রয়োজন মনে করি না। অনূদিত বইটির তিনি নাম রেখেছেন, "ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার অজানা অধ্যায়।"

অপর বইটি আবু রুশদ সাহেবেরই রচনা। নাম বাংলাদেশে 'র'। এ নামের উপরে লেখা "গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা", আর নিচে লেখা "আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান।" প্রকাশক, জিনাফ, ভাসানী ভবন, ৫১ শান্তিনগর (পুরাতন ৮০ নয়া পল্টন)। সচেতন সকল নাগরিকেরই পড়ার মতো এমন একটি বই, যা ভারতের আগ্রাসী নগ্ন চিত্র তুলে ধরেছে। বইটির ভূমিকা লিখেছেন মেজর জেনারেল (অব.) এম এ মতিন বীর প্রতীক। তিনি লিখেন :

www.pathagar.com

যেহেতু আমি বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান গোয়েন্দা সংগঠন 'ডিজিএফআই' অর্থাৎ প্রতিরক্ষা গোয়েন্দা মহাপরিদপ্তরের মহাপরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি সেহেতু এ দেশের বুকে 'র'-এর অপতৎপরতা সম্পর্কে আমার অল্প-বিস্তর ধারণা রয়েছে। অভিজ্ঞতার আলোকে বলা যায়, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে স্বাধীন এ দেশে আমাদের কষ্টার্জিত স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে টিকিয়ে রাখতে হলে বৈরী গুপ্তচর সংস্থার কার্যক্রম সম্পর্কে এ দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক নাগরিককে অবশ্যই অবহিত ও সচেতন থাকতে হবে। সবচেয়ে বড় কথা মহান মুক্তিযুদ্ধে 'র' আমাদের সহায়তা করেছে বলে তাদের পরবর্তী সকল কার্যক্রমকে বাংলাদেশের স্বার্থের অনুকূল বলে মনে করার কোন যৌক্তিকতা থাকতে পারে না। বরং একটি আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন জাতি হিসেবে আমাদের নিরাপত্তার জন্য আমাদেরকেই ভাবতে হবে। আর তাই স্থায়ীভাবে কাউকে আমাদের শত্রু বা মিত্র বলে জ্ঞান করার কোন অবকাশ আছে বলে আমি মনে করি না। আজ যে আমাদের পরম মিত্র, পরিবর্তিত অবস্থার প্রেক্ষিতে কাল সে ঘোরতর শত্রু বলে পরিগণিত হতে পারে– আধুনিক বিশ্বে এ ধরনের নযীর খুব বিরল নয়।

গোয়েন্দা সংস্থার সাবেক প্রধানদের কথা ঃ বাংলাদেশে 'র'– আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তির স্বরূপ সন্ধান' বইটির প্রতিটি পাতায় রয়েছে তথ্য উপাত্তের সাড়ম্বর উপস্থাপনা। স্বাধীন বাংলাদেশের বুকে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা সম্পর্কে লেখকের বিশদ বিবরণ তার অনুসন্ধানী দৃষ্টিভঙ্গি ও কঠোর পরিশ্রমের সাক্ষ্য বহন করে। আশা করি বাংলাদেশে গোপন রাজনীতির ইতিহাসে এ বইটি অনেক না-বলা কথার প্রকাশ ঘটাবে।

উক্ত বইটির ভূমিকা হিসেবে লেখকের কথা

'র' - অর্থাৎ Research and Analysis Wing ভারতের বৈদেশিক গুপ্তচর সংস্থার নাম। ১৯৬৮ সালে তদানীন্তন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী এই সংস্থাটি গঠন করেন। যে উদ্দেশ্য নিয়ে ইন্দিরা গান্ধী RAW প্রতিষ্ঠা করেছিলেন জন্মের মাত্র তিন বছরের মাথায় সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছিলো। ১৯৭১ সালে পাকিস্তান ভেঙে বাংলাদেশ সৃষ্টিতে 'র' যে ব্যাপক ভূমিকা পালন করে এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। এর মাত্র ৪ বছর পর 'র'-এর সার্বিক সহযোগিতায় ভারত সিকিম দখলেও সক্ষম হয়। তাই 'র' সম্পর্কে বলতে গিয়ে "The Illustrated Weekly of India" মন্তব্য করেছে, "RAW"s major triumps in external intelligence were in Bangladesh and Sikkim".

এরপর কিন্তু 'র' থেমে থাকেনি; বরং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রতিটি স্তরে ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা তার তৎপরতা অব্যাহত রেখেছে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশে ভারতের 'বন্ধু সরকারও' 'র'-এর আগ্রাসী গুপ্তচরবৃত্তি থেকে রেহাই পায়নি।

www.pathagar.com

গুপ্তচরবৃত্তি পৃথিবীতে নতুন কোন বিষয় নয়; বরং এটি পৃথিবীর দ্বিতীয় প্রাচীনতম পেশা এবং প্রতিটি দেশেই গুপ্তচর সংস্থা আছে— এটা স্বীকৃত সত্য। আবার শুধু যে নিবর্তনবাদী বা স্বৈরতান্ত্রিক পথে চলা দেশেই ইন্টেলিজেন্স এজেন্সি অতিমাত্রায় তৎপর থাকে তা নয়; বরং গণতান্ত্রিক দেশেও জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য গুপ্তচর সংস্থার প্রয়োজনীয়তা অবধারিত। বিশেষ করে গণতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা, পত্র-পত্রিকা প্রকাশের অবারিত দ্বার উন্মুক্ত থাকে সেখানে বৈরী শক্তির তৎপরতাও চলে গণতান্ত্রিক উদারতার সুযোগ কাজে লাগিয়ে। তাই রাষ্ট্রকে নিরাপদ রাখার জন্য প্রয়োজন হয় শক্তিশালী গুপ্তচর সংগঠনের। এক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সিআইএ, ইংল্যান্ডের এম-১৬, ইসরাঈলের মোসাদ ও ভারতের 'র'-এর নাম উল্লেখ করা যায়। লক্ষ্য করে দেখা যায়, পৃথিবীর যে দেশগুলোয় গণতান্ত্রিক অবকাঠামো যত শক্তিশালী সেসব দেশের গুপ্তচর সংস্থার তৎপরতা, অবকাঠামোও ততোটা ব্যাপ্ত, সমন্বিত ও আধুনিক।

এদিকে সাধারণভাবে বলা যায় যে, গুপ্তচরবৃত্তি সাধারণত তিন প্রকারের–Strategical অর্থাৎ কৌশলগত, Tactical অর্থাৎ মাঠ পর্যায়ের ও Counter Intelligence অর্থাৎ প্রতিগোয়েন্দা তৎপরতা। এখানে স্ট্রাটেজিক্যাল গুপ্তচরবৃত্তি সম্পর্কে বলা যায়, এটি অনেক ব্যাপক পরিসরে পরিচালিত হয়ে থাকে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামরিক ইত্যাদি সকল বিষয়েই বিস্তৃত পরিসরে কৌশলগত গুপ্তচরবৃত্তি চালানো হয়। টার্গেট দেশের সামরিক শক্তি কিরূপ, ভবিষ্যতে কেমন হতে পারে, সেক্ষেত্রে হুমকির খাতসমূহ কী কী বা সাংস্কৃতিক পর্যায়ে শত্রু দেশের সংস্কৃতিকে কিভাবে ধ্বংস করা যায় ইত্যাদি হতে পারে Strategical Intelligence-এর উদাহরণ। অন্যদিকে Tactical Intelligence হচ্ছে মাঠ পর্যায়ের গুপ্তচরবৃত্তি। যেমন- কাউকে অনুসরণ করা, কারো উপরে নজর রাখা ইত্যাদি। আর Counter Intelligence হচ্ছে শত্রুর ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা থেকে নিজ তথ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। এছাড়া নিজ দেশের সরকারি প্রতিষ্ঠান, সশস্ত্রবাহিনী ও গুপ্তচর সংস্থাসহ সকল গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনায় বৈরী গুপ্তচর সংস্থার অপারেটিভ বা এজেন্টদের অনুপ্রবেশ প্রতিহত করাও কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স তৎপরতার অন্যতম লক্ষ্য।

এদিকে বাংলাদেশে 'র' স্ট্রাটেজিক্যাল ও ট্যাকটিক্যাল পর্যায়ে যে গুপ্তচরবৃত্তি পরিচালনা করে আসছে সেখানে ভারত যত না তার জাতীয় নিরাপত্তা রক্ষার জন্য এ কাজে ব্যস্ত তার চেয়ে যাবতীয় উপায়ে বাংলাদেশকে সকল পর্যায়ে হীনবল করে তোলাতেই তারা বেশি তৎপর। এখানে তাদের লক্ষ্য, বাংলাদেশকে সকল পর্যায়ে দুর্বল করে দেওয়া, যাতে সে বাধ্য হয়ে ভারতীয় আধিপত্যকে স্বীকার করে নেয়। আগ্রাসী এই গুপ্তচরবৃত্তি এতোটাই নীতি-নৈতিকতা বর্জিত যে, 'র' এ দেশের বিরুদ্ধে যেমন শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি আন্দোলনের মতো প্রত্যক্ষ সার্বভৌমত্ব বিরোধী

www.pathagar.com

কর্মকাণ্ডকে উসকে দিয়েছে, তেমনি একজন প্রেসিডেন্ট হত্যাকাণ্ডেও পালন করেছে ক্যাটালিস্টের ভূমিকা। বলতে গেলে এ দেশের রাজনীতি, সংস্কৃতি, অর্থনীতি থেকে শুরু করে সামরিক ও ধর্মীয় পর্যায়েও 'র'-এর কালো থাবার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তবে বাংলাদেশে 'র'-এর সবচেয়ে বড় সাফল্য হিসেবে চিহ্নিত হতে পারে এ দেশের বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিসেবী, রাজনীতিবিদ ও জনগণের এক বিরাট অংশকে ভারতীয় মতাদর্শের অনুকূলে প্রভাবিত করা। তাই আজ দেখা যায়, বাংলাদেশে আইএসআই ঘাঁটি গেড়েছে বা কলকাতায় হরকাতুল মোজাহিদীন সদস্য বোমাসহ ধরা পড়েছে এমন ভারতীয় অভিযোগের সপক্ষে এ দেশের একশ্রেণীর পত্র-পত্রিকা প্রচারণা যুদ্ধে নেমে পড়েছে তাৎক্ষণিকভাবে। এদের উদ্দেশ্য যেনো ঐ একটিই– ভারত সরকার যা বলতে চায় তা বলে ভারতের স্বার্থ রক্ষা করা। দুঃখজনক ব্যাপার হলো– এ পক্ষের প্রচারণায় এখন এ দেশের সাধারণ জনতার একাংশ ভারতীয় অভিযোগ সত্য বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে। অথচ এসবই যে জনমতকে বিভ্রান্ত বা প্রভাবিতকরণে 'র'-গৃহীত অপকৌশল তা কিন্তু স্বয়ং ভারতীয় বিশ্লেষকগণই স্বীকার করছেন।

যা হোক, বাংলাদেশবিরোধী 'র' তৎপরতার যৎসামান্য বিবরণ দেওয়ার জন্যই আলোচ্য বইটির প্রকাশ। এক্ষেত্রে 'র'-এর লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও গুপ্তচরবৃত্তির প্রকৃতি বর্ণনার পাশাপাশি তথ্য, প্রমাণ দিয়ে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে পরিচালিত তৎপরতার কথা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ..... এ বইটি লিপিবদ্ধ করার এক পর্যায়ে যখন ডিজিএফআই ও এনএসআই-এর সাবেক ক'জন মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার নেই, 'র' তৎপরতা নিয়ে তখন তাদের কাছ থেকে জানতে পারি পর্দার অন্তরালের অনেক ঘটনাবলি। এছাড়া ব্যক্তিগত পর্যায়ে সাংবাদিক হিসেবে অনেক প্রাক্তন গোয়েন্দা, কর্মকর্তার (সামরিক, বেসামরিক উভয়ই) মতামত জানার সুযোগ হয়েছে বহুবার। অবশ্য এসব সেনসিটিভ বিষয় প্রকাশে তারা তাদের নাম উল্লেখ করতে নিষেধ করেছেন। তাই এখানে বাংলাদেশে দায়িত্বপালনরত ক'জন 'র' কর্মকর্তার সাথে কোন্ কোন্ রাজনৈতিক দলের কোন্ কোন্ নেতার 'সখ্যতা' ছিলো তা সরাসরি না বলে আভাসে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে বাঙালি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দের কথা যেমন বলা হয়েছে তেমনি বাংলাদেশী জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী আপাতঃ 'ভারত বিরোধী' নেতাদের প্রসঙ্গও উদ্ধৃত হয়েছে 'র'-এর সাথে যোগাযোগ রক্ষাকারী হিসেবে। ...

নিছক ভারতবিরোধিতার লক্ষ্যে এ বই লেখা হয়নি; বরং ভারত ও তার গুপ্তচর সংস্থা এ দেশের বিরুদ্ধে কিভাবে, কোন্ পর্যায়ে তৎপরতা চালিয়ে আসছে সেসবের তথ্যসমৃদ্ধ বিবরণ দেওয়াই এ বইয়ের উদ্দেশ্য। তবে এ বইয়ের সবচেয়ে আকর্ষণীয় অংশ হচ্ছে ডিজিএফআই (Directorate General of Forces Intelligence) ও এনএস আই (National Security Intelligence)-এর ক'জন সাবেক

www.pathagar.com

মহাপরিচালকের সাক্ষাৎকার। এগুলো 'গোয়েন্দা বিশ্লেষকদের দৃষ্টিতে বাংলাদেশবিরোধী 'র' তৎপরতা' শিরোনামে দৈনিক ইনকিলাবে প্রতিবেদন আকারে প্রকাশিত হয় অক্টোবর ২০০০-এ। এই প্রতিবেদনগুলোতে সাবেক গোয়েন্দা প্রধানগণ তাদের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে এ দেশে পরিচালিত 'র' তৎপরতা ও রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে এর ব্যাপকতা নিয়ে সুনির্দিষ্ট আলোকপাত করেন। উল্লেখ্য, বাংলাদেশে এ যাবৎ কখনো, কোথাও গোয়েন্দাসংস্থা প্রধানদের এ ধরনের কোন সাক্ষাৎকার প্রকাশিত হয়নি। আশা করি এ থেকে পাঠক এ দেশের ইতিহাসের অনেক অজানা অধ্যায় জানতে পারবেন। সেই সাথে ভারতীয় গুপ্তচরবৃত্তির ভয়াবহতাও অনুধাবন করতে পারবেন সচেতনতার সাথে। অবশ্য জীবন চলার অভিজ্ঞতায় এও জানি– এদেশ এমনি একটি দেশ যেখানে জনগণের এক বিরাট অংশ ভারতীয় প্রচারণায় এমনি বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে যে, হাজারো প্রমাণ উপস্থাপন করলেও এরা 'র'-এর গুপ্তচরবৃত্তির সত্যতা মেনে নিতে চাইবেন না। আবার এমন লোকও দেখেছি, যারা ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে কিছু বললেই তাকে মুক্তিযুদ্ধ বা প্রগতিশীলতা বিরোধিতা বলে ভীষণ ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন। আসলে এরা বুঝতে চান না, ভারতীয় চক্রান্তের বিরোধিতা করার অর্থ পাকিস্তানের পক্ষ নেওয়া নয়। আর মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতার প্রশ্নই উঠে না। কারণ, বাংলাদেশ স্বাধীন থাকুক, চক্রান্ত, ষড়যন্ত্র প্রতিহত করে দিন দিন শক্তিশালী হয়ে উঠুক এ স্বপ্ন সকল বাংলাদেশীর মতো আমিও দেখি। ...

লে. (অব.) আবূ রুশদের পরিবেশিত তথ্যাবলি

উপরিউক্ত গ্রন্থের লেখক লে. (অব.) আবূ রুশদ বাংলাদেশে 'র'-এর তৎপরতা সম্পর্কে বিভিন্ন শিরোনামে যে সব তথ্য পরিবেশন করেছেন তা তারই ভাষায় পরিবেশন করছি :

পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তিবাহিনী গঠন

"ভারতের নতুন দিল্লীস্থ ইন্সটিটিউশন অব স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজের রিসার্চ ফেলো মি. অশোক এ. বিশ্বাস তার এক নিবন্ধে শান্তিবাহিনীর সাথে ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার কথা অকপটে স্বীকার করেছেন। গত ৩১-৮-'৯৪ তারিখে The New Nation পত্রিকায় প্রকাশিত 'RAW's Role in Furthering India's Foreign Policy' শিরোনামের এক নিবন্ধে জনাব বিশ্বাস বলেন, "RAW is now involved in training rebels of Chakma tribes and Shanti Bahini who carry out subversive activities in Bangladesh" অর্থাৎ 'র' এখন চাকমা সম্প্রদায় ও শান্তিবাহিনীকে প্রশিক্ষণ দেওয়ায় প্রত্যক্ষভাবে জড়িত, যারা বাংলাদেশের অভ্যন্তরে বিভিন্ন রকম নাশকতামূলক কাজের সাথে জড়িত।

www.pathagar.com

ঠিক একইভাবে পার্বত্য চট্টগ্রাম জুম্ম শরণার্থী কল্যাণ সমিতির এককালীন সভাপতি উপেন্দ্রলাল চাকমা ১৯৯১ সালে অন্যান্য শান্তিবাহিনী নেতাদের সাথে মতভেদ দেখা দেওয়ার পর বলে ফেলেন যে, "শান্তিবাহিনীর নেতৃত্ব মূলতঃ ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থার হাতে ন্যস্ত।"

ভারত শুধু যে শান্তিবাহিনী সৃষ্টি করেছে তাই নয়; বরং প্রথম থেকেই যাবতীয় উপায়ে শান্তিসেনাদের প্রশিক্ষণ ও সমরাস্ত্র প্রদান করেছে। এ ব্যাপারে আত্মসমর্পণকারী বেশ ক'জন শান্তিসেনার কাছ থেকে জানা যায় যে, "বেশ কিছু শান্তিবাহিনী সদস্য ১৯৭৬ সালে ভারতের দেরাদুনে গেরিলা যুদ্ধ ও জুনিয়র লিডার কোর্সের প্রশিক্ষণ লাভ করে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এসব শান্তিবাহিনী সদস্য প্রাথমিকভাবে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনী ও রাজাকারদের পরিত্যক্ত অস্ত্র দিয়ে সশস্ত্র আন্দোলনের কাজ শুরু করে। ১৯৭৫ সালের শেষার্ধে তারা ভারত হতে প্রথম অস্ত্রের চালান পায়।" (পৃষ্ঠা- ৫৭)

প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান হত্যা

কারা জিয়া হত্যায় জড়িত ছিলো ও কাদের জন্য তাঁকে হত্যা করেছিলো একটি দেশের গুপ্তচর সংস্থা তা সহজেই বোঝা যায় সেই প্রতিবেশী দেশের স্বনামখ্যাত বিশ্লেষকগণের লেখা থেকে। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ করা যায় ভারতীয় প্রতিরক্ষা গবেষক পার্থ সারথি ঘোষের কথা। প্রেসিডেন্ট জিয়াকে ক্ষমতাচ্যুত করে ভারত আসলে কাদের বাংলাদেশের রাষ্ট্রক্ষমতায় আনতে চাইছিলো সে রহস্য পার্থ ঘোষ কোন রাখঢাক না করেই ফাঁস করে দেন তার এক লেখায়। প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যাকাণ্ডের পর বাংলাদেশে যখন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের প্রস্তুতি চলছিলো সে সময় ২৯ আগস্ট '৮১ সংখ্যা ভারতীয় Mainstream পত্রিকায় 'Limits of Diplomacy : Bangladesh' শিরোনামে তার এক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এ নিবন্ধে তিনি উল্লেখ করেন, "আসন্ন নির্বাচনের ফলাফল থেকে ভারত কি পাবে তা বিচার্য বিষয় নয়; কিন্তু মুজিব ও তার উত্তরসূরিদের সাথে অভিজ্ঞতার আলোকে এটা বলা যায় যে, শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগের মধ্যেই ভারতের একটি শক্ত ভিত রয়ে গেছে।" এবং যেহেতু আ'লীগের মধ্যেই কেবল ভারতের 'ভিত' রয়ে গেছে তাই এই আ'লীগকে যে কোন উপায়ে ক্ষমতায় আনাই ছিলো ভারতের লক্ষ্য। এ ব্যাপারে ভারতের গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে অত্যন্ত সুস্পষ্টভাবে মি. পার্থ সারথি ঘোষ মন্তব্য করেন, "কিন্তু ঘটনা প্রবাহ ভারতের অনুকূলে নিয়ে আসায় কিভাবে প্রভাব খাটানো যায়? এটি নিশ্চিত যে, শুধু কূটনীতি দিয়ে তা করা সম্ভব নয়; বরং রাজনৈতিক ভিত্তি মজবুত করার জন্য আওয়ামী লীগকে গোপনীয়ভাবে যাবতীয় সাহায্য প্রদান করতে হবে এবং এরকম গোপন সাহায্য প্রদানের ক্ষেত্রে অতি অবশ্যই যে কোন প্রকার নৈতিক সংস্কার বা নীতিকে বর্জন করতে হবে।" অর্থাৎ এ বিশ্লেষণ থেকে এ কথাই প্রমাণিত হয় যে, আ'লীগ ছাড়া অন্য কোন রাজনৈতিক দলকে ভারত তাদের

www.pathagar.com

স্বার্থরক্ষাকারী বলে মনে করে না। এবং এই আ'লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্যই তারা 'গোপনীয়' অনেক কাজ করেছে, যে 'কাজের' অন্যতম হলো প্রেসিডেন্ট জিয়াকে হত্যা।

মূলতঃ '৭৫-এর ১৫ আগস্ট পট পরিবর্তনের পর ভারত বাংলাদেশে জাতীয়তাবাদী শক্তিকে হটিয়ে একটি 'বন্ধুভাবাপন্ন' রাজনৈতিক দলকে ক্ষমতায় আনার জন্য উঠেপড়ে লেগে পড়ে। এক্ষেত্রে আ'লীগই হচ্ছে সেই রাজনৈতিক দল এবং আ'লীগকে ক্ষমতায় আনার জন্যই ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র' জিয়া হত্যার পরিকল্পনা প্রণয়ন করে। এ ব্যাপারে ১৫ মার্চ '৮৯ সংখ্যা দৈনিক আনন্দবাজার পত্রিকায় ঋতু সারিন প্রদত্ত তথ্যের উল্লেখ করা যায়। জনতা দলীয় এমপি মি. সুব্রামনিয়াম স্বামীর উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি উল্লেখ করেন, 'র'ই মূলত জিয়াকে হত্যা করেছে। এদিকে কলকাতা থেকে প্রকাশিত অপর একটি ইংরেজি সাপ্তাহিক 'সানডে' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি রিপোর্টের উদ্ধৃতি দিয়ে ঢাকার The New Nation পত্রিকার এক রিপোর্টে বলা হয়– "ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র' ভারতের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনক্রমে প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানকে হত্যার ষড়যন্ত্র করে এবং নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করে।" উক্ত রিপোর্টে বলা হয় যে, "মুজিব হত্যার প্রতিশোধ হিসেবে ভারতে জিয়া হত্যার ষড়যন্ত্র দানা বাঁধে। কিন্তু ষড়যন্ত্র যখন পেকে ওঠে, সেই সময় ইন্দিরা গান্ধীর কংগ্রেস সরকারের পতন ঘটে। মোরারজি দেশাই ক্ষমতায় আসেন। প্রতিবেশী রাষ্ট্রপ্রধানের বিরুদ্ধে হত্যা ষড়যন্ত্রের কথা শুনে তিনি 'সন্ত্রস্ত' হয়ে উঠেন এবং হত্যা বন্ধ করেন। এরপর ১৯৮০ সালে ইন্দিরা গান্ধী পুনরায় ক্ষমতায় এলে প্রেসিডেন্ট জিয়া নৃশংসভাবে নিহত হন।" ...

অন্যদিকে জিয়া হত্যার মাত্র ১২ দিন পূর্বে শেখ হাসিনা ভারত থেকে বাংলাদেশে ফিরে আসেন। "ভারত থেকে বাংলাদেশে প্রত্যাবর্তনের মাত্র তিন দিন পরই ভারত সৈন্য নামিয়ে তালপট্টি দ্বীপটি দখল করে নেয়। সারাদেশ প্রতিবাদে ফেটে পড়লেও তিনি ছিলেন নিশ্চুপ। তার প্রত্যাবর্তনের ১৩ দিনের মাথায় দেশী-বিদেশী চক্রান্তকারীদের হাতে নিহত হলেন প্রাণপ্রিয় নেতা প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান। হত্যাকাণ্ডের খবর পেয়ে সিলেট থেকে ঢাকা ফেরার সময় শেখ হাসিনা ব্রাহ্মণবাড়িয়ার সীমান্ত দিয়ে পাড়ি জমানোর প্রয়াস পান। সীমান্তরক্ষীরা বাধ সাধেন।" (পৃষ্ঠা ঃ ৬২ ও ৬৩)

'স্বাধীন বঙ্গভূমি' আন্দোলন

জে. জিয়াউর রহমান নিহত হওয়ার পর 'র' বাংলাদেশের জনগণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে তখনি প্রকাশ্যে মাঠে নামার সাহস পায়নি। কিন্তু ২৪ মার্চ '৮২ তারিখে যেদিন নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট বিচারপতি সাত্তারকে সরিয়ে জে. এরশাদ ক্ষমতা গ্রহণ করেন ঠিক তার পরদিন অর্থাৎ ২৫ মার্চ '৮২ তারিখে ঘোষিত হয় তথাকথিত 'স্বাধীন

www.pathagar.com

বঙ্গভূমি' নামের একটি পৃথক রাষ্ট্র। বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তবর্তী এলাকা- খুলনা, যশোর, ফরিদপুর, কুষ্টিয়া, বরিশাল ও পটুয়াখালী নিয়ে এই স্বঘোষিত হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের যাবতীয় চক্রান্ত চালানো হয় পশ্চিমবঙ্গ থেকে। ভারতীয় গুপ্তচর সংস্থা 'র'-এর প্রত্যক্ষ মদদে সৃষ্ট এই বঙ্গভূমি আন্দোলন। শুধুমাত্র রাজনৈতিক দাবিই নয়; বরং একটি সশস্ত্র গ্রুপও তৈরি করা হয় বাংলাদেশে অনুপ্রবেশের জন্য। 'বঙ্গসেনা' নামের এই সশস্ত্রবাহিনীটির নেতৃত্ব দেন এক সময়কার আ'লীগ নেতা ডা. কালীদাস বৈদ্য। ৪টি দলীয় সংগঠন বিএলও, বিএলটি, এলটিবি ও আরএসএসও পৃথক পৃথকভাবে স্বাধীন বঙ্গভূমি চক্রান্তে মদদ জোগায়। (পৃষ্ঠা ঃ ৬৪ ও ৬৫)

স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্রের প্রথম ব্লু প্রিন্ট

তথাকথিত 'স্বাধীন বঙ্গভূমি' তৈরির চক্রান্ত গত কয়েক বছর ধরে তোড়জোড় চললেও স্বাধীন হিন্দু রাষ্ট্র চক্রান্তের প্রথম ব্লু প্রিন্ট তৈরি হয় পঞ্চাশ দশকে।

ডা. কালীদাস বৈদ্য তার 'বঙ্গভূমি ও বঙ্গসেনা' বইতে স্বীকার করেছেন, ১৯৫২ সালে কালীদাস বৈদ্য, চিত্তরঞ্জন ছুতোর ও নীরদ মজুমদার এই তিনজন উগ্রপন্থী যুবক তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে গিয়ে সংখ্যালঘু হিন্দু সম্প্রদায়ের মুক্তির জন্য ব্যাপক কর্মতৎপরতা চালায়। সেই সাথে গোপনে হিন্দুদের স্বাধীনতা ও স্বতন্ত্র বাসভূমির কথাও প্রচার করেন। সাম্প্রতিক স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনকে চাঙ্গা করতে ডা. কালীদাস বৈদ্য ও চিত্তরঞ্জন ছুতোরই সবচেয়ে বেশি কাজ করছেন। এরা তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান ও বাংলাদেশে বহুদিন ভারতের এজেন্ট হিসেবে কাজ করেছেন। বাংলাদেশে চিত্তরঞ্জন ছুতোর রাজনৈতিকভাবে বেশ প্রভাবশালী হয়ে ওঠেন। এর মূলে ছিলো ভারত সরকারের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। মুজিব সরকারের উপর প্রভাব খাটানোর জন্যই ইন্দিরা সরকার তাকে সবসময়ই যথাসাধ্যভাবে ব্যবহার করেছেন। এখনও তার সাথে বাংলাদেশী একটি দলের যোগাযোগ অব্যাহত রয়েছে। অনেকের মতে, তার সাথে 'রুশ কানেকশনও' জড়িত। বনগাঁ সীমান্তে স্বাধীন বঙ্গভূমি সমর্থকদের ব্যাপক প্রচারের প্রাণকেন্দ্র হলো ভবানীপুরের রাজেন্দ্র রোডের চিত্তরঞ্জন ছুতোরের বিলাসবহুল বাড়ি। এখন এটাই হচ্ছে বঙ্গসেনার ঘাঁটি। (পৃষ্ঠা ঃ ৬৬)

ভারত সরকারকে মদদ দিতেই হবে

ডা. কালীদাস বৈদ্য বলেন, ভারত সরকার বঙ্গসেনাদের মদদ দিচ্ছেন, বলতে পারেন প্রশ্রয় দিচ্ছে। তবে মদদ আমাদের দিতেই হবে। সেই ক্ষেত্র আমরা তৈরি করছি। আমরা ভারত সরকারের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলছি। আমাদের বক্তব্য আমরা তাদের ক্রমাগত বোঝাবার চেষ্টা করছি। যদি সত্যি সেই সম্ভাব্য জনসমর্থন পাই, ভারত সরকারকে একদিন সৈন্য বাহিনী দিয়ে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। আমাদেরও সরকার আছে, সেনাবাহিনী আছে, তবে ভারতীয় সেনাবাহিনী 'বঙ্গসেনা' নামেই এ্যাকশনে নামবে।

www.pathagar.com

এভাবে স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের নামে 'র' যে বাংলাদেশবিরোধী চক্রান্তেই অবতীর্ণ হয় তা নয়; বরং বাংলাদেশকে গ্রাস করারও পরিকল্পনা করে। এ ব্যাপারে ঢাকার ইংরেজি সাপ্তাহিক 'ঢাকা কুরিয়ার'-এর সহকারী সম্পাদক ইরতিজা নাসিম আলীর সাথে ডা. কালীদাস বৈদ্যের একটি সাক্ষাৎকারের উদ্ধৃতি দেওয়া যায়। ১৯৮৯ সালের মে মাসে প্রকাশিত ঐ সাক্ষাৎকারে ইরতিজা নাসিম আলী কালীদাস বৈদ্যের কাছে প্রশ্ন রেখেছিলেন, "আচ্ছা বলুন তো বঙ্গভূমি আন্দোলনের বিকল্প কি হতে পারে?" তাৎক্ষণিকভাবে কালীদাস বৈদ্য উত্তর দিয়েছিলেন, "বিকল্প একটাই, বাংলাদেশ যদি ভারতের অঙ্গরাজ্য হয়ে নীরবে বশ্যতা স্বীকার করে নেয়। এই বশ্যতা স্বীকারেই কেবল বঙ্গভূমি আন্দোলন বন্ধ হতে পারে।" (পৃষ্ঠা ঃ ৬৭) ...

সরকারের ভেতরে বাইরে বিভিন্ন স্তরে
৩০ হাজার 'র'-এর এজেন্ট তৎপর

বিশেষ প্রতিবেদন ঃ বাংলাদেশের সরকার, প্রশাসন, শিল্প, বাণিজ্য, ব্যাংক, বীমা, বিভিন্ন করপোরেশন, রেলওয়ে, বিমান, রেল পরিবহণ তথা যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রতিরক্ষা, খনিজ, পররাষ্ট্র, শিক্ষা সংস্কৃতিসহ প্রতিটি স্তরে ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা 'র'-এর নেটওয়ার্ক চালু করা হয়েছে।

প্রশাসনের কোন কোন ক্ষেত্রে 'র'-এর পুরো নিয়ন্ত্রণ কায়েম করা হয়েছে। চিহ্নিত বিরোধী দল ছাড়াও অন্যান্য সংগঠনগুলোতে তাদের এজেন্টরা সক্রিয়। সারা বাংলাদেশে সর্বমোট ৩০ হাজারেরও বেশি 'র'-এর এজেন্ট তৎপর রয়েছে।

মন্ত্রী, এমপি, আমলা, রাজনীতিবিদ, শিল্পপতি, ব্যবসায়ী, বুদ্ধিজীবী, লেখক, কবি, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, শিল্পী, প্রকাশক, অফিসার, কর্মচারী ইত্যাদি পর্যায়ের লোকজনই শুধু নয়; ছাত্র, শ্রমিক, কেরানী, পিয়ন, রিকশাওয়ালা, ঠেলাওয়ালা, কুলি, ট্যাক্সি ড্রাইভার, ট্রাভেল এজেন্ট, ইন্ডেন্টিং ব্যবসায়ী, সিএন্ডএফ এজেন্ট, নাবিক, বৈমানিক, আইনজীবীসহ বিভিন্ন স্তরে তাদের এজেন্ট সক্রিয় রয়েছে।

অত্যন্ত শক্তিশালী কাউন্টার ইন্টেলিজেন্স নেটওয়ার্ক ছাড়া এসব ছড়িয়ে থাকা এজেন্টদের সনাক্ত করা বা তাদের কাউন্টার করা সম্ভব নয়। হয়ত গোয়েন্দা অফিসেই কাজ করছে বাংলাদেশের সরকারি কর্মচারী অথচ সে লোকটিই 'র'-এর পে-রোলে কাজ করছে।

ঢাকা জিয়া আন্তর্জাতিক বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম ও সিলেট বিমান বন্দর, চট্টগ্রাম, মঙ্গলা সমুদ্র বন্দরসহ ঢাকা ও নারায়ণগঞ্জের নদী বন্দরগুলোতেও 'র'-এর এজেন্টরা সক্রিয়। সচিবালয় থেকে প্রধানমন্ত্রীর অফিস পর্যন্ত তাদের নেটওয়ার্ক রয়েছে।

বার্মার সৈন্য সমাবেশ, ভারতের চর দখল, ৫৩ জন জেলে ধরে নিয়ে যাওয়া, দেশের অভ্যন্তরে নানাবিধ বিক্ষোভ, ধর্মঘট, কর্মবিরতি, দাবিদাওয়া উত্থাপন, চরম

www.pathagar.com

সময়সীমা ঘোষণা, রেল স্টেশনে আগুন, বিদ্যুৎ শ্রমিক কর্মচারীদের ধ্বংসাত্মক আন্দোলন, শিক্ষকদের কর্মবিরতি ইত্যাদি প্রতিটি কর্মকাণ্ড নির্দিষ্ট নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চালানো হচ্ছে। (পৃষ্ঠা ঃ ১২৫)

ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি

বেগম খালেদা জিয়া ক্ষমতাসীন হওয়ার পর একশ্রেণীর বুদ্ধিজীবী, সংস্কৃতিকর্মী এমন প্রচার-প্রচারণা শুরু করে দেন যে, জামায়াতে ইসলামীর সমর্থনে সরকার গঠন করে বিএনপি স্বাধীনতার চেতনা বিসর্জন দিয়েছে এবং জামায়াতই হচ্ছে বাংলাদেশের একমাত্র সমস্যা। এদের প্রচারণা এতোটাই সমন্বিত ও সর্বব্যাপী ছিলো যে, সরকারও এক পর্যায়ে ঘাবড়ে যায়, ভাবতে থাকে না জানি কে কি মনে করছে। ফলশ্রুতিতে বিএনপি'র দোদুল্যমান নেতৃত্ব ২৪ মার্চ '৯২ তারিখে সবাইকে অবাক করে দিয়ে জামায়াতের আমীর জনাব গোলাম আযমের নাগরিকত্ব বাতিলের পাশাপাশি তাকে গ্রেফতার করে জেলহাজতে প্রেরণ করে। এর মাত্র দু'দিন পর ২৬ মার্চ আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় ঘাদানি অর্থাৎ ঘাতক দালাল নির্মূল কমিটি। জাহানারা ইমামের নেতৃত্বে এই কমিটি কাদের সহায়তায়, কোন সূত্রে প্রাপ্ত অর্থে সারাদেশব্যাপী ব্যাপক প্রচারণাযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলো তা বিবেচনায় না এনেও বলা যায়, শুধুমাত্র বিএনপি'কে বিপদে ফেলা ও জামায়াতের কাছ থেকে আলাদা করে রাজনৈতিকভাবে দুর্বল করে দেওয়াই ছিলো এই আন্দোলনের লক্ষ্য। এ যুক্তির সপক্ষে বিস্তারিত তথ্য প্রমাণ উপস্থাপনেরও প্রয়োজন নেই। শুধু লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে ১৯৯৪ সালে তত্ত্বাবধায়ক সরকার ইস্যুতে সৃষ্ট আন্দোলনে জামায়াত আ'লীগের শরীকে পরিণত হওয়ার সাথে সাথেই এই ঘাদানি কমিটির সকল দাবি হাওয়ায় মিলিয়ে যায়। তাই তারা একসময় গণআদালত গঠন করে 'ঘাতক গোলাম আযমের' ফাঁসি দাবি করলেও আ'লীগ-জাপা-জামায়াত জোট গঠনের পর একটিবারের জন্যও সেই ফাঁসির রায় কার্যকর করার টু শব্দটি পর্যন্ত করেনি।

এদিকে ঘাদানি গঠন ও এর উদ্দেশ্য যে 'ঘাতকদের' বিচার নয়; ভিন্ন কিছু ছিলো সে ব্যাপারে ঘটনা বিশ্লেষণ করে দেখা যায়, প্রাথমিক পর্যায়ে কর্নেল কাজী নুরুজ্জামানের উৎসাহে ক'জন মুক্তিযোদ্ধা '৭১-এর যুদ্ধাপরাধীদের বিচার ও প্রতিরোধকল্পে একটি কমিটি গঠনের উদ্যোগ নেয়। এদের বেশিরভাগই সরাসরি আ'লীগ বা অন্য কোন বুর্জোয়া দলের সদস্য বা সমর্থক ছিলেন না। জানা যায়, আলাপ আলোচনার পর আলোচ্য কমিটির নাম রাখার সিদ্ধান্ত হয় 'ঘাতক দালাল প্রতিরোধ কমিটি'। এটি '৯১ সালের ডিসেম্বর-এর কথা। মাঝে লে. কর্নেল নুরুজ্জামানের এককালীন ঘনিষ্ঠ এক 'বিশিষ্ট' সাংবাদিক হুট করে এই কমিটির নাম থেকে 'প্রতিরোধ' শব্দ বাদ দিয়ে 'নির্মূল' শব্দ ব্যবহারের কথা বলেন। এরপর কোথা দিয়ে কি হলো, স্রোতের মতো এগিয়ে এলেন জাহানারা ইমামসহ অসংখ্য ভারতপন্থী ব্যক্তিত্ব। নির্দলীয়

www.pathagar.com

মুক্তিযোদ্ধাদের আইডিয়া পরিবর্তিত আকারে হাইজ্যাক হয়ে গেলো কেউ কিছু বুঝে ওঠার আগেই। সুযোগ বুঝে আ'লীগ নেতৃবৃন্দ ভাগ বসালো 'মুক্তিযুদ্ধের চেতনা' প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে। কিন্তু যখন পারপাস সার্ভ হয়ে গেলো তখন 'ঘাতক' জামায়াতই আবার হয়ে গেলো 'মুক্তিযোদ্ধা'দের আন্দোলনের সাথী। এরপর ১৯৯৯ সালের ৩০ নভেম্বর পর্যন্ত এই ঘাদানি'র কোন সাড়াশব্দ ছিলো না। বিএনপি, জাপা, জামায়াত, ইশা আন্দোলন একজোট হওয়ার মুহূর্তে আবার চারদিকে 'ঘাতকদের ষড়যন্ত্র' খুঁজে পায় ঘাদানি। অথচ, ১৯৯৬ সালের সালের সংসদ নির্বাচনে তাদের পছন্দনীয় সরকার ক্ষমতায় আসার পর একবারও 'ঘাতক গোলাম আযমের' ফাঁসির রায় কার্যকর করার দাবি জানায়নি ঘাদানি নেতৃবৃন্দ। এ থেকেই কি বোঝা যায় না, কি উদ্দেশ্যে, কাদের স্বার্থে ও কাদের বিরোধিতা করার জন্য এই কমিটির সৃষ্টি? (পৃষ্ঠা : ১৬১ ও ১৬২)

'লজ্জা' ও তসলিমা নাসরিন ইস্যু সৃষ্টি

বাবরী মসজিদ ভাঙার পরিপ্রেক্ষিতে বাংলাদেশের জাতীয় সংসদে গৃহীত নিন্দা প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভারত সরকার প্রচ্ছন্ন হুমকি প্রদর্শন করে ২৩ জানুয়ারি '৯৩ তারিখে। এর মাত্র পাঁচ দিনের মাথায় শুরু হওয়া একুশে বইমেলায় প্রকাশিত হয় তসলিমা নাসরিনের 'লজ্জা'। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নেই, হিন্দুদের উপর চলছে নির্যাতন এসব কাল্পনিক কথামালাই ছিলো 'লজ্জা' উপন্যাসের মূল উপজীব্য। এই উপন্যাসের মাধ্যমে যে বিষবাষ্প ছড়ানো হয়েছে তাতে সে সময় সমগ্র বিশ্বে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি দারুণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ভারতে নয়, বাংলাদেশে সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন চলছে–'লজ্জা' উপন্যাসের মাধ্যমে 'র' সে কথাই প্রতিষ্ঠিত করেছে সার্থকভাবে।

একথা হয়তো সাধারণ সাহিত্য সমালোচক, বুদ্ধিজীবীদের কাছে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, 'লজ্জা' নিছক একটি উপন্যাস; কিন্তু তসলিমা নাসরিনের সৃষ্টি বা 'লজ্জার' প্রকাশ কখনোই কোন গতানুগতিক সাংস্কৃতিক বিষয় ছিলো না; বরং 'লজ্জা' উপন্যাসের মধ্য দিয়ে 'র'-বাংলাদেশে 'নজর' রাখার হুমকি দেওয়ার মাত্র সাপ্তাহখানেকের ব্যবধানে চরমতম প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আপাত 'নির্দোষ' একটি সাহিত্যকর্মের সাহায্যে একটি দেশকে কখনো কেউ এতো বড় বিপদে ফেলে দিতে পারেনি– যা 'র'- সার্থকভাবেই করেছে।

তসলিমা নাসরিন যে 'র'-এর সৃষ্টি ও তার লজ্জা উপন্যাস যে বাংলাদেশকে সাম্প্রদায়িক দেশ হিসেবে চিহ্নিত করার জন্য প্রকাশ করা হয়েছিলো সে সম্পর্কে পরবর্তীতে অনেক তথ্য প্রমাণ পাওয়া গেছে। এমনকি ভারতীয় বিশ্লেষকগণও তসলিমা নাসরিনের 'র'-এর সংশ্লিষ্টতা সম্পর্কে বিভিন্ন মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এদেরই একজন হলেন– ভারতের 'ইন্সটিটিউট অব স্ট্রাটেজিক স্টাডিজের' গবেষক

www.pathagar.com

অশোক এ. বিশ্বাস। ৩১ আগস্ট '৯৪ সংখ্যা 'দি নিউ নেশন' পত্রিকায় প্রকাশিত 'Raw's role in furthering India's foreign policy' শীর্ষক এক নিবন্ধে মি. আশোক বিশ্বাস উল্লেখ করেন যে, বিএনপি সরকারকে বিশ্ব দরবারে সাম্প্রদায়িক, সংখ্যালঘু নির্যাতনকারী হিসেবে চিত্রিত করার জন্য 'র' তসলিমা ইস্যু সৃষ্টি করেছে। তিনি একে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে 'র'-এর অন্যতম বড় সাফল্য বলেও মন্তব্য করেন। তার ভাষ্যমতে, 'এই অনৈতিক, তৃতীয় শ্রেণীর লেখিকাকে আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে কলকাতার প্রচার মাধ্যম এবং তাঁকে পুরো আর্থিক সহায়তা দিয়েছে 'র' ... এবং 'র' খুব ভালোভাবেই জানতো যে, তসলিমা ইস্যু কিভাবে বাংলাদেশের ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের মাঝে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করবে। একথা মনে রেখেই তারা বাংলাদেশের ভেতরে গোলযোগ সৃষ্টি ও পাশাপাশি পশ্চিমা নারীবাদী সংগঠনসহ ইসলামবিরোধী লবীকে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে উসকে দেওয়ার জন্যই 'লজ্জা'সহ অন্যান্য উগ্র কাজে তসলিমাকে লেলিয়ে দেওয়া হয়।

এদিকে বাংলাদেশে 'লজ্জা' উপন্যাস প্রকাশের সমান্তরালে ভারতের পশ্চিমবঙ্গে বিজেপিসহ অন্যান্য হিন্দু সংগঠনগুলো তসলিমার সমর্থনে এগিয়ে আসে। এছাড়া আনন্দবাজার গোষ্ঠী ব্যাপক কভারেজ দেয় তসলিমা নাসরিনকে। এরা 'লজ্জা'কে প্রমাণ হিসেবে উপস্থাপন করে এ কথাই প্রচার করে যে, বাংলাদেশে আশঙ্কাজনক হারে হিন্দুদের উপর নির্যাতন চলছে। এ নিয়ে সে সময় বাংলাদেশে কি ভয়াবহ পরিস্থিতির উদ্ভব হয় তা তৎকালীন পত্র-পত্রিকায় চোখ রাখলেই বোঝা যেতো। এখানে উল্লেখ্য, 'র'-এর প্রচারণা সহায়তাকারী আনন্দবাজার গোষ্ঠী পরবর্তীতে তসলিমাকে আনন্দ পুরস্কারে ভূষিত করে। এরপর দীর্ঘদিন তসলিমা পশ্চিমা দেশগুলোয় বসবাস করে কোন উন্নত সাহিত্যকর্ম উপহার দিতে ব্যর্থ হওয়ায় ১৯৯৯ সালে আবার ফিরে আসে ভারতে। এবারও তাকে পূর্ণ পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করে আনন্দবাজার গ্রুপ। এমনকি ২০০০ সালে দ্বিতীয় বারের মতো তসলিমা নাসরিন ভূষিত হন 'আনন্দ পুরস্কারে'। (পৃষ্ঠা ঃ ১৮১ ও ১৮২) ....

হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের তৎপরতা

অংকের সূত্রের মতো হয়তো প্রমাণ দেওয়া যাবে না যে, হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বাংলাদেশে ভারতীয় স্বার্থের অনুকূলে কাজ করে যাচ্ছে বা তাদের কোন কোন নেতা 'র'-এর সাথে যুক্ত। তবে ১৯৮৮ সালের ২০ মে জন্ম নেওয়া এই সংগঠনটি বাংলাদেশ, বাংলাদেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ, তাদের সংস্কৃতি, ধর্ম ও ইতিহাস, ঐতিহ্যের বিরুদ্ধে বিষোদগার করে আসছে একের পর এক। '৮৮ সালে সংবিধানে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলামকে স্বীকৃতি দেওয়ার পর সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর তথাকথিত স্বার্থরক্ষাকারী এই 'ঐক্য পরিষদ' প্রতিটি পর্যায়েই মাঠে নেমেছে সংখ্যালঘুর স্বার্থরক্ষার আড়ালে বাংলাদেশের স্বাধীন অস্তিত্ব বিনাশের লক্ষ্য নিয়ে।

www.pathagar.com

এমনকি ২০০০ সালে এরা সংবিধান থেকে 'বিসমিল্লাহ' ও 'রাষ্ট্রধর্ম ইসলাম' বাদ দেওয়া না হলে পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনেরও হুমকি প্রদান করে। এসব থেকেই বোঝা যায়, ঐক্য পরিষদের সহজ, সরল লক্ষ্য হলো, যে কোন উপায়ে বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিস্থিতি বা গৃহযুদ্ধের অবস্থা সৃষ্টি করে 'সংখ্যালঘুর জীবন বাঁচানোর' দাবি নিয়ে প্রতিবেশী দেশের হস্তক্ষেপের পথ সুগম করা। ১৯৯১ থেকে '৯৬ সাল পর্যন্তও এই সংগঠনটি একই লক্ষ্য নিয়ে একের পর এক বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক প্রচারণা চালিয়েছে। বিশেষ করে '৯০ সালে ভারতের বাবরী মসজিদ নিয়ে সৃষ্ট উত্তেজনা ও '৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর উগ্র হিন্দু কর্তৃক বাবরী মসজিদ ভেঙে ফেলার পর হিন্দু-বৌদ্ধ-খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ ব্যাপক পরিসরে বাংলাদেশবিরোধী তৎপরতায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার হলো- ভারতে বিজেপি বা উগ্র হিন্দু সংগঠনগুলো বাংলাদেশের বিপক্ষে যেসব প্রচারণা চালিয়েছে এ দেশে ঠিক তার সমান্তরাল কর্মসূচিই পালন করেছে ঐক্য পরিষদ। বলতে গেলে এদের সরবরাহকৃত কাল্পনিক ও বানোয়াট তথ্য উপাত্তসমূহকেই ভারতীয় সরকার ব্যবহার করেছে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করায়। .... (পৃষ্ঠা ঃ ১৮৭)

গোয়েন্দা সংস্থার যাদের সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে

আবু রুশদ সাহেব বাংলাদেশের সামরিক ও বেসামরিক যে দুটো প্রধান গোয়েন্দা সংস্থার প্রধান কর্মকর্তাদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছেন তাদের তালিকা নিম্নে দেওয়া হলো :

১. ব্রিগেডিয়ার (অব.) আমিনুল হক, বীর উত্তম, সাবেক মহাপরিচালক, এনএসআই (National Security Intelligence)।

২. মেজর জেনারেল এমএ হালিম, পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক ডিজিএফআই (Directorate General, Forces Intelligence)।

৩. মেজর জেনারেল (অব.) এমএ মতিন বীর প্রতীক, পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক ডিজিএফআই।

৪. মেজর জেনারেল (অব.) মহব্বত জান চৌধুরী, সাবেক মহাপরিচালক, ডিজিএফআই।

৫. মেজর জেনারেল (অব.) জেডএ খান পিএসসি, সাবেক মহাপরিচালক আইবি, ডিজিএফআই।

বাংলাদেশের নিরাপত্তায় নিয়োজিত গোয়েন্দা সংস্থা প্রধানগণ 'র'-এর কর্মতৎপরতা সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি অবহিত হওয়াই স্বাভাবিক। তাই তাদের মন্তব্য এ বিষয়ে শুধু নির্ভরযোগ্যই নয়, অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণও বটে।

জনাব আবু রুশদ তাদেরকে যেসব প্রশ্ন করেন এর জওয়াব থেকে বাছাই করে অধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ও জওয়াব এখানে পরিবেশন করছি। কতক প্রশ্ন সবাইকে করা হয়েছে। কোন কোন প্রশ্নের জওয়াবে তারা যা বলেছেন তা প্রায় একই রকম। তাই

www.pathagar.com

তাদের একজনের জওয়াবই উদ্ধৃত করেছি। ...

মেজর জেনারেল গোলাম কাদের

এ উপমহাদেশের ক্ষমতার ভারসাম্য, রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক মেরুকরণের প্রকৃতি বিবেচনায় বাংলাদেশে 'র'-এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সম্পর্কে মে. জে. কাদেরের অভিমত হলো– ভারতীয় নীতিনির্ধারক মহলের গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কৌশলগত প্রভাব বিস্তারের লক্ষ্যে 'র' গোপন সহায়তা প্রদান করে থাকে। তার মতে, দক্ষিণ এশিয়ায় একাধিপত্য বিস্তারে ভারতীয় কৌশলবিদগণ একাডেমিক্যালি যে চিন্তা-চেতনা পোষণ করেন 'র'-এর দায়িত্ব হচ্ছে সেসবের বাস্তবায়নে ইন্টেলিজেন্স তৎপরতা পরিচালনা করা। এক্ষেত্রে 'র'-এর সর্বপ্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সকল পর্যায়ে বাংলাদেশকে ভারতের বাধ্যগত রাখা, যাতে এ দেশে সরকার গঠন ও দেশ চালনা থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, সমরনীতিসহ সবক্ষেত্রেই ভারতের আনুকূল্যের উপর নির্ভর করতে হয়। এ ব্যাপারে মে. জে. কাদের-এর দৃঢ় বিশ্বাস যে, এ দেশে 'র'-এর অন্যতম লক্ষ্য হলো বন্ধুপ্রতিম দেশগুলোর কাছ থেকে বাংলাদেশকে দূরে সরিয়ে আনা, বন্ধুহীন করে তোলা। যাতে এক পর্যায়ে বাধ্য হয়ে বাংলাদেশকে ভারতের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়তে হয়। এক্ষেত্রে ব্যাপক প্রচারণার মাধ্যমে মৌলবাদ, তালেবান, উত্তর-পূর্ব ভারতে আইএসআই তৎপরতা ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টি করে বাংলাদেশীদের মধ্যে অপরাধবোধ জাগিয়ে তুলেও উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে 'র' তৎপরতা চালিয়ে আসছে বলে মে. জে. কাদের-এর ধারণা। .... (পৃষ্ঠা ঃ ২২০)

প্রশ্ন ঃ 'র' বাংলাদেশে কিভাবে, কোন্ সেক্টরে কাজ করে থাকে?

মে. জে. হালিম ঃ আমাদের দেশের প্রায় সব গুরুত্বপূর্ণ সেক্টরে 'র' তাদের অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছে। 'র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী সেক্টরভেদে গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। এর মাঝে উল্লেখযোগ্য সেক্টর হচ্ছে– মিডিয়া, শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্পবাণিজ্য খাত। অতিসূক্ষ্মভাবে 'র' এসব সেক্টরে অনুপ্রবেশ করে এবং ধীরে ধীরে সকল পর্যায়ে প্রভাব বিস্তার করে। দেখা গেছে, 'র' তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য রাজনীতিবিদ, বুদ্ধিজীবী, শিল্পী ও শিক্ষার্থীদের বেছে নেয় এবং বিভিন্ন কৌশলে এদের 'ক্রয়' করে। এ ধরনের কৌশলের মধ্যে রয়েছে খেতাব প্রদান, ডিগ্রি প্রদান, বৃত্তি প্রদান, কম খরচে লেখাপড়ার ব্যবস্থা করা ও বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে বিশেষ অতিথি হিসেবে নিমন্ত্রণ করে তাঁকে বিশেষ সম্বর্ধনা দেওয়া ইত্যাদি ... ইত্যাদি।

আবার অনেককে 'র' ভাতাও প্রদান করে থাকে। এ ব্যক্তিবর্গ 'র'-এর মুখপাত্র হিসেবে কাজ করে এবং 'র'-এর দেওয়া নীতি-আদর্শ প্রচার করে। প্রচারমাধ্যম হিসেবে তারা ব্যবহার করে নিউজ মিডিয়া, জনসভা, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম, লিফলেট, বই-পুস্তক প্রভৃতি। এসব মাধ্যমে 'র' নির্দেশিত এমন প্রচারণাই চালানো হয়, যা আমাদের দেশের প্রচলিত আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থা, প্রথা ও বিশ্বাস, যার উপর

www.pathagar.com

সমাজ দৃঢ়ভাবে গঠিত হয় সেসবকে হেয় প্রতিপন্ন করে এবং তার পরিবর্তে বিজাতীয় ('র'-এর প্রেসক্রিপশন অনুযায়ী) প্রচলিত ব্যবস্থা ও বিশ্বাসকে বড় করে দেখায়।

এছাড়া 'র' ও তার এজেন্টরা দেশের নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কেও অপপ্রচার করে থাকে। এক্ষেত্রে নিরাপত্তা বাহিনীর ছোট-খাটো ভুলভ্রান্তি খুব বড় করে জনসম্মুখে উপস্থাপন করে জনগণকে নিরাপত্তা বাহিনী সম্পর্কে বিভ্রান্ত করে তোলা হচ্ছে 'র'-এর অন্যতম অপকৌশল। এদিকে ভারত কখনও চায়নি যে, স্বাধীন বাংলাদেশে কোন সামরিক বাহিনী থাকুক। আজকাল প্রায়ই কিছু বুদ্ধিজীবী, কলামিস্ট, রাজনীতিবিদকে বলতে শোনা যায়, বাংলাদেশে সশস্ত্র বাহিনীর কোন প্রয়োজন নেই। মজার ব্যাপার হলো এই স্লোগানটি হচ্ছে 'র'-এর; কিন্তু উচ্চারিত হচ্ছে বাংলাদেশীদের মুখ থেকে। ...... (পৃষ্ঠা ২২৪)

প্রশ্ন. এ দেশের একজন জনপ্রিয় প্রেসিডেন্ট হত্যা, শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পেছনে 'র'-এর ভূমিকা সম্পর্কে আপনার অভিমত কি?

মে. জে. মতিন ঃ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হত্যাকাণ্ড সম্পর্কে 'র'-এর প্রত্যক্ষ সংশ্লিষ্টতার কোন প্রমাণ আমাদের হাতে না থাকলেও ভারতীয় পত্র-পত্রিকায় এ নিয়ে অনেক রিপোর্ট প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে Sunday পত্রিকায় জনতা দলের সাবেক এমপি সুব্রামনিয়াম স্বামীর লেখা থেকে দেখা যায় যে, জিয়া হত্যায় 'র' জড়িত ছিলো। এছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীন সত্তা ও অখণ্ডতাকে বিনষ্ট করার প্রয়াসে এ দেশের বুকে তথাকথিত শান্তিবাহিনী, বঙ্গভূমি ইত্যাদি ইস্যু সৃষ্টির পিছনেও 'র' বরাবরই active role তথা সক্রিয় ভূমিকা পালন করে আসছে।

এ কথা আমাদের কারোই অজানা নয়, 'র'-এর সক্রিয় সাহায্য ও মদদপুষ্ট হয়েই তথাকথিত শান্তিবাহিনী নামধারী পার্বত্য চট্টগ্রামের বিদ্রোহী চাকমারা ভারতের অভ্যন্তরে ত্রিপুরা ও মিজোরাম রাজ্যের সীমান্ত এলাকায় স্থাপিত তেত্রিশটিরও অধিক ক্যাম্পে অবস্থান করেছে দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে। সেখানে ভারতীয় বিএসএফ-এর সার্বিক তত্ত্বাবধানে তাদের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থা, প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ এবং বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্যপরিচালনার জন্য প্রশিক্ষণ প্রদান করা হতো। এসব ক্যাম্প ছিলো তাদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এসব ক্যাম্প থেকেই বিদ্রোহী চাকমারা ভারতীয় বিএসএফ কর্তৃক প্রদত্ত অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে বাংলাদেশের অভ্যন্তরে নাশকতামূলক কার্যপরিচালনা করেছে, পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে বাঙালি উৎখাতের নামে শত শত বাঙালিকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে। ... (পৃষ্ঠা : ২৩১)

প্রশ্ন. তাহলে কি আপনি বলতে চাচ্ছেন ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ ধীরে ধীরে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠায় এগিয়ে যাচ্ছে?

মে. জে. জেড এ খান ঃ অনেকটা তাই। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পূর্বেও '৪৭ সালে যখন ভারত ভাগ হয়ে গেলো, তখন ভারতীয় নীতিনির্ধারকগণ তা

www.pathagar.com

মেনে নিতে পারেনি। বরাবরই তাদের লক্ষ্য হলো অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা করা। এ মর্মে প্রথম থেকেই তারা অনেক উদ্যোগ নিয়েছে। যখন দেখল স্বাভাবিক পথে পারছে না তখন তারা ঠিক করল যদি পাকিস্তানকে দুটো ছোট ভাগে ভাগ করা যায় তাহলে পাকিস্তান দুর্বল হয়ে যাবে, যাদেরকে প্রয়োজনে যে কোন খাতে পরাভূত করা সহজ হবে। এছাড়া ছোট রাষ্ট্র হলে প্রভাব বলয়ে নিয়ে আসা যাবে যে কোন মুহূর্তে। এতে ভারতের বহু কাঙ্ক্ষিত স্বপ্ন বাস্তবায়ন বা অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্ট্রাটেজি বাস্তবায়নের পথও হবে সুগম। 'র'-এর মাধ্যমে সে পথেই এগিয়ে যাচ্ছে ভারত। ...

(পৃষ্ঠা ঃ ২৪০)

প্রশ্ন. এ কথা অস্বীকার করার উপায় নেই যে, ৭১-এ 'র' মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে তারা এতোটা বৈরিতা শুরু করল কেন?

মে. জে. জেড এ খান ঃ '৭১-এর 'র' আমাদের মুক্তিযুদ্ধে সহায়তা করেছে কথাটা সত্য। তবে ১৬ ডিসেম্বরের আগে ভারত যে পরিকল্পনা করেছিলো, সেই পরিকল্পনার উদ্দেশ্য ছিলো যদি বাংলাদেশ স্বাধীন হয় তাহলে এখানে 'র' একটা স্থান করে নিতে পারবে। কিন্তু এ দেশের মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ যেমন পূর্বেও তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের প্রভাব বরদাশত করেনি, তেমনি বাংলাদেশ হওয়ার পরও চায়নি ভারত তাদের ওপর কোন প্রভাব বিস্তার করুক। 'র' এটা জানতো। তবুও তারা মুক্তিযুদ্ধে সাহায্য করেছিলো একটাই উদ্দেশ্যে যে, একটা শক্তিশালী দেশকে ভেঙে দু'টি দুর্বল দেশ করতে পারলে তা ভারতের এ এলাকায় বিরাট প্রভাব বলয় সৃষ্টিকে নিশ্চিত করবে। বাংলাদেশ হওয়ার পর ভারতের সেনাবাহিনী যেভাবে লুটপাট করেছে বা যেভাবে ভারত আমাদের প্রশাসনে তাদের নিজস্ব লোক বসিয়ে প্রশাসন চালাতে চেয়েছে তা দেখে বাংলাদেশীরা শঙ্কিত হয়ে পড়ে। তাদের আশঙ্কা জাগে যদি 'র'-কে বাধা দেওয়া না হয়, তাহলে আস্তে আস্তে আমাদের বাংলাদেশকে ভারতের একটি অঙ্গরাজ্য হিসেবে গ্রাস করতে তারা উদ্যোগ নেবে। ...

(পৃষ্ঠা ঃ ২৪১)

প্রশ্ন. এক্ষেত্রে এজেন্ট নিয়োগে প্রভাবিত করায় 'র'-এর কৌশল কি?

মে. জে. জেড এ খান ঃ কৌশল তিন-চার রকম হয়ে থাকে। একটা হচ্ছে অর্থনৈতিক সহযোগিতা। তবে অর্থ দেওয়া হয় কিন্তু ব্লাকমেইল করার জন্য; সহযোগিতার লক্ষ্যে নয়। এখানে ছোট হলেও একটা না একটা প্রমাণ তারা রাখবে, প্রয়োজনবোধে নাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়ানোর জন্য। তখন ব্লাকমেইলিং-এর ভয়ে বাধ্য হয়েই অর্থ গ্রহণকারী 'র'-এর পক্ষে কাজ করে। এ পর্যায়ে হয়তো অর্থগ্রহণকারী 'সম্মানিত ব্যক্তি' সম্মান রক্ষার জন্য বাধ্য হয়েই তথ্য প্রচার থেকে শুরু করে গুপ্তচরবৃত্তির বেড়াজালে জড়িয়ে যায়।

www.pathagar.com

অর্থের বাইরে নারী, সুরা এ দুটোর লোভে পড়েও অনেকে ফেঁসে যায়। আবার বিভিন্ন সম্মান লাভ, ভ্রমণের ব্যবস্থা করা, হয়ত পিএইচডি করার ইচ্ছে আছে পয়সা নেই এ অবস্থায় অর্থের যোগান দেওয়া, সপরিবারে বিশ্বের লোভনীয় স্থানগুলো দেখার ব্যবস্থা করে দেওয়া ইত্যাদির মাধ্যমে টোপ ফেলে 'র'। মোটকথা, চাহিদার দিকে লক্ষ্য রেখে সেদিকেই বড়শি ফেলা হয়। তবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি হলো অর্থ। এছাড়া আরেকটি দিকে 'র' বিশেষ নজর দিয়ে থাকে। এটি হলো সংবাদ মাধ্যম ও পত্রিকার কলামিস্ট। কারণ, জনমত গঠন বা প্রভাবিত করায় কলামিস্টদের ও সাংবাদিকদের ব্যাপক ভূমিকা রয়েছে। তাই এই সেক্টরে 'র' বিশেষভাবে তৎপর। একথা সবাই জানে যে, একজন প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব বা কলামিস্টের কথা সহজ-সরল জনগণ অকপটে বিশ্বাস করে। তাই এদেরই একটি অংশের মাধ্যমে 'র' তাদের ('র') কথাটাই প্রচার করে প্রয়োজন মতো।

প্রশ্ন. প্রেসিডেন্ট জিয়া হত্যা, শান্তিবাহিনী ও স্বাধীন বঙ্গভূমি আন্দোলনের পিছনে 'র'-এর হাত রয়েছে—এটি কতটুকু বিশ্বাসযোগ্য?

মে. জে. জেড এ খান ঃ এখানে প্রথমে আমি বঙ্গভূমির কথায় আসি। আমি যখন ডিজিএফআইতে ছিলাম তখন এই ইস্যু নিয়ে তোলপাড় সৃষ্টি হয়। সে সময় আমি নিজে বাগেরহাট ও সাতক্ষীরা গিয়েছিলাম পুরো বিষয়টি নিয়ে তদন্ত করতে। যেহেতু ব্যক্তিগতভাবে তদন্ত চালানোর সময় বিভিন্ন ঘরে গিয়েছি, বিভিন্ন জনের সাথে কথা বলেছি, তাতে আমার বদ্ধমূল ধারণা হয়েছে যে, বঙ্গভূমি সম্পূর্ণরূপে 'র'-এর একটি প্রকল্প। দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের ওসব এলাকায় 'র'-এর এজেন্ট অপারেটিভ রয়েছে। একদিন তো আমরা এক অপারেটিভকে ধরেই ফেলতে পারতাম, কিন্তু কোন এক কারণে অল্পের জন্য তাকে ধরা যায়নি। এখানে স্পষ্টতই বলা যায় যে, বঙ্গভূমি তৎপরতার সাথে স্থানীয় প্রশাসনেরও অনেকে জড়িত ছিলেন, এখনও থাকতে পারেন। বঙ্গভূমি সম্পর্কে আমার কোনরকম সন্দেহ নেই যে, 'র'-এর সাথে জড়িত।

এরপর আসা যাক শান্তিবাহিনী প্রসঙ্গে। আমি পার্বত্য চট্টগ্রামে কাজ করেছি। আমার ও আমার অন্যান্য সহকর্মীর নিশ্চিত ধারণা ছিলো যে, শান্তিবাহিনী-সমস্যা তৈরির পিছনে 'র'-এর হাত রয়েছে। দেখা যেত নিউইয়র্কে জাতিসংঘ দপ্তরে যখন সভা হতো বা পৃথিবীর অন্যান্য স্থানে যখন মানবাধিকার সংক্রান্ত সেমিনার বা আলোচনা সভা হতো, সেখানে শান্তিবাহিনীর সদস্যরা প্রচার পুস্তিকা, লিফলেট নিয়ে হাজির হতো, যার প্রায় সবগুলোই ছাপা হতো ভারতে। প্রশ্ন হচ্ছে, ঐ সম্মেলনে উপস্থিত হওয়া ও প্রচারণা চালানোর অর্থ তারা কোত্থেকে পেতো? এছাড়া তারা বাংলাদেশী পরিচয়ে যেতো না, যেতো অন্য পরিচয়ে। এই পরিচিতি কারা দিতো? এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজলেই পাওয়া যাবে 'র'-এর নাম। একইভাবে একসময় ময়মনসিংহ অঞ্চলে গারোল্যান্ড প্রতিষ্ঠার আন্দোলনও মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছিলো। কিন্তু ডিজিএফআই ও অন্যান্য সহযোগী সংস্থার ত্বরিত ভূমিকার জন্য সেটি বিস্তৃত হতে পারেনি। তারপর কাদেরিয়া বাহিনীর

www.pathagar.com

প্রসঙ্গও তোলা যায়। '৭৬-৭৭ সালে কাদের সিদ্দিকীর নেতৃত্বাধীন এই বাহিনী যখন বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে লিপ্ত, ঘটনাচক্রে তখন আমার পোস্টিং ছিলো টাঙ্গাইলে। আমি অনেক অপারেশন করেছি কাদেরিয়া বাহিনীর বিরুদ্ধে। তখন ওদের কারা সহযোগিতা করেছে, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র দিয়েছে তা তো সবারই জানা। এদিকে জিয়া হত্যায় তো অনেকেই বলেন যে, 'র' এতে জড়িত ছিলো। ভাবুক দৃষ্টিকোণ থেকেও আমরা যদি চিন্তা করি যে, জিয়া হত্যার বেনিফিশিয়ারি কারা হয়েছে, তাহলেই বুঝতে পারব এর পিছনে কারা আছে। এটা আমার ধারণা, জেনারেল জিয়া যদি Continue করতে পারতেন তাহলে আজ বাংলাদেশের চেহারা অন্যরকম হতে পারতো। ভারতের পাশে একটা শক্তিশালী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের অবস্থান হতে পারতো। কিন্তু ভারতের লক্ষ্য ছিলো, তারা কিছুতেই বাংলাদেশকে শক্তিশালী হতে দেবে না। ঐ দৃষ্টিকোণ থেকে চিন্তা করলে বুঝতে অসুবিধা হবে না যে, এর পিছনে 'র'-এর হাত থাকার সম্ভাবনা আছে।... (পৃষ্ঠা : ২৪৩ ও ২৪৪)

আওয়ামী লীগ বাংলাদেশে ভারতের কর্তৃত্ব চায়

আওয়ামী লীগের আজব রাজনৈতিক কার্যকলাপ ও ভারতের প্রভাবশালী পত্রিকাসমূহের ভূমিকা এবং পশ্চিমবঙ্গ ও ত্রিপুরা রাজ্যসহ ভারতের কেন্দ্রীয় সরকারের আচরণ থেকে বাংলাদেশের রাজনৈতিক সচেতন মহলে সুস্পষ্ট ধারণা জন্মেছে যে, আওয়ামী লীগ ভারতের সমর্থন ও সহযোগিতায় দেশে ক্ষমতাসীন হতে আগ্রহী। এতোদিন এ বিষয়টা ধারণা ও অনুমান হিসেবেই বিবেচিত হচ্ছিলো; কিন্তু ১৫ ডিসেম্বরের (২০০৪) পর এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেলো।

১৫ ডিসেম্বর বিজয় দিবস পালন উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক জনাব আবদুল জলিল এমপি স্পষ্ট ভাষায়ই ভারতকে বাংলাদেশের উপর হামলা করার উদাত্ত আহ্বান জানালেন।

ঢাকার সিরডাপ মিলনায়তনে আয়োজিত ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী বুদ্ধিজীবী নেতা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ভাইস চ্যান্সেলর ও বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির সভাপতি ড. একে আজাদ চৌধুরী। উক্ত সভায় বাংলাদেশে নিযুক্ত ভারতের ডেপুটি হাই কমিশনার বাবু সর্বজিত চক্রবর্তী রীতিমতো হুমকির ভাষায় বক্তব্য রেখেছেন।

উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগের দ্বিতীয় প্রধান ব্যক্তি হিসেবে জনাব আবদুল জলিল যা বলেছেন তা এ কথাই প্রমাণ করে যে, আওয়ামী লীগ জনগণের ভোটের জোরে ক্ষমতায় যাবার আশা ত্যাগ করেছে। ক্ষমতায় যাবার জন্য তারা ভারত সরকারের প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপ কামনা করছেন। গত নির্বাচনে ক্ষমতা হারিয়ে তারা এমন হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছেন যে, '৭১ সালের স্বাধীনতা যুদ্ধে ভারতের প্রত্যক্ষ ভূমিকার পটভূমি ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্যটুকু উপলব্ধি করার যোগ্যতাও হারিয়ে ফেলেছেন।

www.pathagar.com

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির খবর যেভাবে পত্রিকায় এসেছে

ভারতীয় পত্রিকা হিসেবে পরিচিত দৈনিক জনকণ্ঠ এমন নগ্ন ভারতপ্রেমিক বক্তব্য প্রকাশ করা সমীচীন মনে করেনি। দৈনিক যুগান্তর নিম্নরূপ সংবাদ প্রকাশ করেছে ঃ

অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠাই ছিলো মুক্তিযুদ্ধের মূল লক্ষ্য

বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির অনুষ্ঠানে জলিল

যুগান্তর রিপোর্ট ঃ আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বলেছেন, সাম্প্রদায়িকতাকে চিরতরে কবর দিতে না পারলে বাংলাদেশের অস্তিত্ব থাকবে না। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বাধীনতা আনার পেছনে মূল লক্ষ্যই ছিলো অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠা। আজ দেশে যে সাম্প্রদায়িকতাকে রাষ্ট্রীয়ভাবে সহায়তা করা হচ্ছে এমন বাংলাদেশের জন্য মুক্তিযুদ্ধ করিনি। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের সব দল ও মহলকে ঐক্যবদ্ধভাবে সাম্প্রদায়িক শক্তিকে উৎখাত করার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, স্বাধীনতার ৩৩ বছরের লগ্নে মুক্তিযোদ্ধারা রাস্তায় ভিক্ষা করে আর রাজাকারের গাড়িতে রক্তমাখা পতাকা ওড়ে। এজন্য স্বাধীনতা আসেনি।

আবদুল জলিল বুধবার সিরডাপ মিলনায়তনে মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির ভাষণে এ কথা বলেন। এতে সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির নবনির্বাচিত সভাপতি ও সাবেক ভিসি অধ্যাপক ড. একে আজাদ চৌধুরী। বক্তৃতা করেন ওয়ার্কার্স পার্টির সভাপতি রাশেদ খান মেনন, গণফোরামের সাধারণ সম্পাদক সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, জাসদের সহ-সভাপতি শরীফ নূরুল আম্বিয়া, সাবেক উপাচার্য ড. দুর্গাদাস ভট্টাচার্য, ঢাকাস্থ ভারতীয় দূতাবাসের উপরাষ্ট্রদূত সর্বজিত চক্রবর্তী, ড. জাহিদ হাসান, কলকাতা মিউনিসিপাল সদস্য দিলীপ ব্যানার্জি, সাংবাদিক আমিনুল ইসলাম বেদু, অধ্যাপক নিমচন্দ্র ভৌমিক।

দৈনিক ইনকিলাবের খবর

মুক্তিযুদ্ধের চেতনা রক্ষায় ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে

আবদুল জলিল

ট্রানজিটের জন্য আর বেশিদিন অপেক্ষা করবো না

ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার

স্টাফ রিপোর্টার ঃ মহান বিজয় দিবস উপলক্ষে গতকাল ঢাকায় বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতি আয়োজিত এক আলোচনা সভায় আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল এমপি বলেছেন, ১৯৭১-এ আমরা পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছিলাম। বাংলাদেশকে একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য স্বাধীনতা যুদ্ধ করিনি। অথচ বাংলাদেশকে এখন একটি উদার মুসলিম রাষ্ট্রে

www.pathagar.com

পরিণত করার মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধের সেই চেতনাকে চ্যালেঞ্জ করা হচ্ছে। আর এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব বর্তমানে ভয়াবহ বিপদের সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। তিনি বলেন, মুক্তিযুদ্ধের চেতনার শরীক ভারতও। কারণ ভারতের রাষ্ট্রীয় মূলনীতি ও আদর্শিক চেতনা এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতার মূলনীতি ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এক ও অভিন্ন। এ কারণেই বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে ভারত সহায়তা দেয়।

তাই মুক্তিযুদ্ধের এ চেতনাকে রক্ষা করতে এখন ভারতকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। তিনি বর্তমান ৪ দলীয় জোট সরকারকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনাবিরোধী এবং মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী শক্তিকে লালনকারী অপশক্তি আখ্যায়িত করে এই সরকারের সাথে নীতিগত কোন সম্পর্ক না রাখার জন্যও ভারতের প্রতি আহ্বান জানান। আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথির বক্তৃতায় ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী বলেন, বাংলাদেশের ভিতর দিয়ে উত্তর-পূর্ব ভারতে আসা-যাওয়ার জন্য ট্রানজিট একটি অনিবার্য বিষয়। ভারতকে এই ট্রানজিট প্রদানের জন্য বাংলাদেশ চুক্তিবদ্ধ। কিন্তু একমাত্র পানিপথ ছাড়া অন্যান্য পথে ভারতকে এই ট্রানজিট দিতে বাংলাদেশ দীর্ঘদিন যাবৎ কালক্ষেপণ করে চলেছে। এ অবস্থায় ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না। বাংলাদেশের সাথে ভারতের পানি সমস্যা সম্পর্কে তিনি বলেন, বাংলাদেশকে ভারত প্রয়োজনের তুলনায় অনেক বেশি পানি দিচ্ছে। তিনি উল্লেখ করেন, বর্ষাকালসহ বছরে বাংলাদেশের মানুষের মাথাপিছু পানির প্রাপ্যতা হচ্ছে ২০ হাজার কিউসেক। আর ভারতে তা ১ হাজার ৮শ' কিউসেক মাত্র। সুতরাং এই পানিও যদি বাংলাদেশের জন্য পর্যাপ্ত না হয় তবে আর কতোটা হলে পর্যাপ্ত হবে?

আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক আবদুল জলিল বর্তমান সরকার ও তার রাজনৈতিক চেতনাকে প্রতিরোধ করার আহ্বান জানিয়ে আরও বলেন, আমরা আবার ক্ষমতায় গেলে ভারতের সাথে বাংলাদেশের যত সমস্যা আছে তার সবই সমাধান করা হবে।

ভারতের সহায়তা ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জন সম্ভব ছিলো না উল্লেখ করে তিনি বলেন, ভারত ও বাংলাদেশের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। কারণ এ দু'দেশের ঐতিহাসিক সম্পর্ক মহান মুক্তিযুদ্ধের রক্তের বন্ধনে আবদ্ধ। ভারত এ দেশের স্বাধীনতা অর্জনে যে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তা সারাজীবন আমরা শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করবো উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, এ দেশের ভারতবিরোধী অপপ্রচারের মধ্য দিয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করার জন্য চিহ্নিত মহলটির অপপ্রয়াস মুক্তিযুদ্ধকালীন সময় থেকেই চলে আসছে। কিন্তু এ দেশের সচেতন মানুষ ঐ অপপ্রচারে কখনো বিভ্রান্ত হয়নি বলেই তারা এখনো ভারতের প্রতি কৃতজ্ঞ এবং দু'দেশের সম্পর্ক আরও ঘনিষ্ঠ করতে আগ্রহী।

www.pathagar.com

আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ও মুক্তিযোদ্ধাদের চেতনায় পার্থক্য

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আওয়ামী লীগ অবশ্যই রাজনৈতিক নেতৃত্ব দিয়েছে। কিন্তু আওয়ামী নেতারা বাস্তবে মুক্তিযুদ্ধ করেননি। মুক্তিযোদ্ধাগণ ও তাদের সহায়ক ও সমর্থক জনগণ অবশ্যই পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে বাংলাদেশকে একটি স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে কায়েম করার উদ্দেশ্যে সংগ্রাম করেছেন।

আওয়ামী লীগ নেতা আবদুল জলিল মুক্তিযুদ্ধের যে উদ্দেশ্যের কথা বর্ণনা করেছেন মেজর জিয়াউর রহমান, মেজর আবদুল জলিল ও অন্যান্য সেক্টর কমান্ডারগণ এবং মুক্তিযুদ্ধের সর্বাধিনায়ক জেনারেল আতাউল গনী ওসমানী ঐ রকম ভাষায় বর্ণনা করেছেন বলে জানা যায় না। আওয়ামী নেতারা ঐ উদ্দেশ্যে স্বাধীনতা চেয়ে থাকলে আলাদা কথা। জনগণ তাদের ঐ উদ্দেশ্য জানলে হয়তো তাদেরকে সমর্থনই করতো না।

জলিল সাহেবের বক্তব্যের তাৎপর্য

২০০১-এর নির্বাচনের পর পূর্ণ তিন বছর জোট-সরকারকে উৎখাত করতে ব্যর্থ হয়ে তিনি সরাসরি ভারত সরকারকে তাদের উদ্দেশ্য পূর্ণ করার জন্য এগিয়ে আসার উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ভারতের এগিয়ে আসার পদ্ধতিটা কী? '৭১ সালে যেভাবে ভারত সরকার সামরিক শক্তি প্রয়োগ করেছিলেন সেভাবেই বাংলাদেশে আক্রমণ করা ছাড়া এগিয়ে আসার কোন বিকল্পই হতে পারে না। তাহলে আওয়ামী লীগ চায় যে, ভারত এ দেশটা দখল করে আফগানিস্তানের হামীদ কারজাইর মতো আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় বসিয়ে দিক। এটাই তাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনার প্রমাণ। এরপরও কি আওয়ামী লীগকে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি বলে স্বীকার করা সম্ভব?

ডেপুটি হাই কমিশনারের ধৃষ্টতা

এ সভায় ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী "ট্রানজিটের জন্য আমরা আর বেশি দিন অপেক্ষা করতে পারি না" বলে যে সুস্পষ্ট হুমকি দিয়েছেন এর জন্য আওয়ামী লীগই দায়ী। আওয়ামী নেতা তো শুধু হুমকিতেই সন্তুষ্ট নন। তিনি তো চান যে, ভারত হামলা করুক। তাই ঐ হুমকিতে নিশ্চয়ই তিনি পুলক অনুভব করেছেন। আওয়ামী লীগের মতো একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক দলের এমন নগ্ন আহ্বানে উৎসাহিত হওয়াই তো স্বাভাবিক। আমার ধারণা, ভারত সরকার আওয়ামী নেতাদের মতো এতোটা নির্বোধ নয় যে, বাংলাদেশের জনগণের বিরুদ্ধে আওয়ামীদের ডাকে সাড়া দেবে।

'৭১ সাল ও বর্তমান পরিস্থিতির পার্থক্য

১৯৭০ সালের নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জনগণের চরম আবেগপূর্ণ সমর্থন নিয়ে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক আইনসভার প্রায় সকল আসনে জয়ী হয়। ইয়াহইয়া-ভূট্টো চক্র ব্যালটে

www.pathagar.com

বিজয়ী শক্তিকে বুলেট দ্বারা দমনের অপচেষ্টা চালায়। নির্বাচিত আওয়ামী নেতারা ভারতে যেয়ে আশ্রয় নেন। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাঙালি অফিসার ও জোয়ানরা বিদ্রোহী হয়ে মুক্তিযুদ্ধ শুরু করেন। উদ্বুদ্ধ হয়ে তাদের নেতৃত্বে স্বাধীনতাপাগল যুবক-কিশোররা দলে দলে মুক্তিযুদ্ধে শরীক হয়। জনগণ তাদেরকে পূর্ণ সমর্থন দেয়।

এ পরিবেশে ভারতের ইন্দিরা গান্ধী সরকার পাকিস্তানকে ভাঙার উদ্দেশ্যে মুক্তিযুদ্ধের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন এবং পাকিস্তানের শত্রু সোভিয়েত রাশিয়ার পূর্ণ সহযোগিতা অর্জন করতে সক্ষম হন। মুক্তিযোদ্ধা ও জনগণ অবশ্যই স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করেছিলো। কিন্তু ভারত বাংলাদেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে এখানে তাদের পূর্ণ আধিপত্য কায়েমের হীন উদ্দেশ্যেই ঐ ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। এটা ভারতের জন্য এক মহাসুযোগই ছিলো।

কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতি কী, তা আওয়ামী লীগ নেতা যথাযথ উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছেন। ৪ দলীয় জোট সরকার সশস্ত্র সংগ্রাম করে ক্ষমতায় আসেনি। এটা ইয়াহইয়া সরকার নয়। ২০০১ সালের নির্বাচনে জনগণ আওয়ামী লীগকে ক্ষমতায় ফিরে আসতে না দেবার সিদ্ধান্তক্রমেই চারদলীয় জোটকে সংসদের দু'তৃতীয়াংশ আসনে বিজয়ী করে ক্ষমতাসীন করেছে। কোন দলীয় সরকারের অধীনে ঐ নির্বাচন হয়নি। নির্বাচন অনুষ্ঠানের সময় আওয়ামী লীগের নির্বাচিত বিচারপতি শাহাবুদ্দীন আহমদ দেশের প্রেসিডেন্ট ছিলেন। শেখ হাসিনার নিযুক্ত আমলা জনাব এমএ সাঈদ প্রধান নির্বাচন কমিশনারের দায়িত্ব পালন করেন। কেয়ারটেকার সরকার প্রধান বিচারপতি লতিফুর রহমান কোন সময় রাজনৈতিক দলের সমর্থক ছিলেন বলে কেউ দাবি করেননি। ঐ নির্বাচনে পুলিশ, বিডিআর ও সেনাবাহিনী নির্বাচনকে সুষ্ঠু করার উদ্দেশ্যে প্রয়োজনীয় ভূমিকা পালন করেছে। এসব বাহিনী কোন রাজনৈতিক দলের পক্ষে বা বিপক্ষে নয়। বিশেষ করে সেনাবাহিনী রাজনীতির ধারে-কাছেও নেই।

বিপুল জনসমর্থন পেয়ে জোট সরকার ক্ষমতায় এসেছে। এ সরকারকে আওয়ামী লীগ গত ৩০.০৪.০৪ তারিখে পদত্যাগে বাধ্য করার ঘোষণা দিয়েছিলো। ২১ আগস্টের গ্রেনেড হামলাকে মূলধন বানিয়ে সরকারকে উৎখাত করার চেষ্টাও করেছিলো। তাদের ডাকে জনগণ সাড়া দেয়নি। গণ-আন্দোলন করে সরকারকে পদত্যাগে বাধ্য করার হুমকি অব্যাহতভাবে তারা দিয়ে চলেছেন। গণভিত্তিহীন বামদলগুলোকে সাথে নিয়ে তারা মরিয়া হয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতা সৃষ্টির চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

শেখ হাসিনা এ সরকারকে তালেবান আখ্যায়িত করে আফগানী স্টাইলে বাংলাদেশে আক্রমণ করার জন্য আমেরিকাকে উসকে দেবার সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। এখন তার পক্ষ থেকে দলের সাধারণ সম্পাদক ভারতের দুয়ারে ধরনা দিয়েছেন। তারা টের পাচ্ছেন না যে, জনগণ ভারত সরকারকে এ দেশের বন্ধু মনে করে না। তাই ভারতের প্রতি তাদের আহ্বান তাদেরকে চরমভাবে গণবিচ্ছিন্ন করে ছাড়বে।

www.pathagar.com

মৈত্রী সমিতির আরো মারাত্মক আলোচনা

২০০৫ সালের ৩০ মার্চ সিরডাপ মিলনায়তনে বাংলাদেশ-ভারত মৈত্রী সমিতির এক আলোচনা সভা সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. এ কে আযাদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। প্রধান অতিথি ছিলেন আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়াম সদস্য সুরঞ্জিত সেন গুপ্ত এমপি এবং বিশেষ অতিথি ছিলেন ঢাকাস্থ ভারতীয় ডেপুটি হাই কমিশনার সর্বজিত চক্রবর্তী। আলোচনায় অংশ নেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক সমিতির সভাপতি প্রফেসর ড. আরেফিন সিদ্দিকী, পিএসসি-র সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর ড. মুস্তফা চৌধুরী, শিল্প ব্যাংকের সাবেক চেয়ারম্যান প্রফেসর আশরাফ উদ্দীন চৌধুরী এবং আরো অনেকে।

৩১ মার্চ দৈনিক ইনকিলাবে আলোচকগণের বক্তব্য নিম্নরূপ ভাষায় প্রকাশিত হয়।

'ভারতের বন্ধুত্ব ও সাহায্য ছাড়া বাংলাদেশের স্বাধীনতা-সার্বভৌমত্ব রক্ষা করা যাবে না। ভারতকেই বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় নিরাপত্তা উল্লেখ করে তারা আরো বলেন, এ অবস্থায় বাংলাদেশের জন্য বিপুল ব্যয়ে এবং মিথ্যা জুজুর ভয় দেখিয়ে বড় ধরনের সেনাবাহিনী পোষা বোকামি। বাংলাদেশের জনগণকে ভারতই বর্তমানে খাইয়ে-পরিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছে মন্তব্য করে তারা বলেন, ভারতের চাল-ডাল খেয়ে, ভারতের কাপড় পরে এ দেশে ভারতের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করা যাবে না। ভারত ১৯৭১ সালে বাংলাদেশকে স্বাধীন না করে দিলে বাংলাদেশ কখনো স্বাধীন হতে পারত না এবং আজও পাকিস্তানের দাসত্ব করতে হতো উল্লেখ করে তারা বলেন, ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্বকে চিরদিন সজীব রাখতে এই বন্ধুত্বের গোড়ায় নিয়মিত পানি ঢালতে হবে। তারা বাংলাদেশের স্বাধীনতাবিরোধী চীন-মার্কিন-পাকিস্তানের পণ্য বর্জন করে বাংলাদেশের জন্মকালীন বন্ধু ভারতের পণ্য ব্যবহার আরো বাড়ানোর পরামর্শ দিয়ে বলেন, আজ হোক কাল হোক ভারতকে বাংলাদেশের ওপর দিয়ে ট্রানজিট দিতেই হবে। আর এ ট্রানজিটই ভারতের সাথে বাংলাদেশের বাণিজ্য ভারসাম্য কমিয়ে আনবে।'

বক্তারা একই সঙ্গে বর্তমান সরকার স্বাধীনতার রক্ষক হতে পারে না বলে মন্তব্য করেন। তারা সরকারকে সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী আখ্যা দিয়ে আশা ব্যক্ত করেন যে, এই সাম্প্রদায়িক ও মৌলবাদী শক্তির উৎখাতে শিগগিরই বাংলাদেশে গণঅভ্যুত্থান হবে।

আওয়ামী লীগ ভারতের কোনো বাড়াবাড়ির প্রতিবাদ করে না

২০০৮ সালের ১৭ ও ১৮ জুলাই দিল্লিতে বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে সচিব পর্যায়ে বৈঠক হয়। ১৭ জুলাই চাঁপাইনবাবগঞ্জে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর লোক বাংলাদেশের দু কিলোমিটার অভ্যন্তরে ঢুকে বিডিআর-এর দুজন সৈনিককে গুলি করে

www.pathagar.com

হত্যা করে। এর বিরুদ্ধে সারা দেশে তীব্র প্রতিবাদের ঝড় উঠে। আওয়ামী লীগ ও এর তল্পীবাহক বাম দলগুলো ছাড়া ছোট-বড় সকল রাজনৈতিক দল এর প্রতিবাদে বিবৃতি দেয় ও সমাবেশ করে।

এককালীন আওয়ামী লীগ নেতা বঙ্গবীর আবদুল কাদের সিদ্দিকী সঙ্গতভাবেই প্রশ্ন তুলেছেন যে, এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ নিশ্চুপ কেন?

বাংলাদেশের উপর দিয়ে ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রদেশসমূহে অবাধে যাতায়াত করার জন্য করিডোর দেবার দাবি উপরিউক্ত দিল্লি বৈঠকে আলোচনা না করার দাবিতে সকল দেশপ্রেমিক দল, সংগঠন ও ব্যক্তিত্ব অত্যন্ত সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। আওয়ামী লীগ নেতা আমীর হোসেন আমুর উপস্থিতিতে এ সময়ই একটি মুক্তিযোদ্ধা সংগঠন ভারতকে ট্রানজিট দেবার দাবি জানায়।

চট্টগ্রামের প্রখ্যাত আওয়ামী নেতা মহিউদ্দীন চৌধুরী জোট সরকারের আমলে এ কথা ঘোষণা করতে দ্বিধা করেননি যে, 'আমরা ক্ষমতায় গেলে ভারতের সকল দাবি পূরণ করব।'

ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর গুলিতে প্রায়ই বাংলাদেশি নিহত হচ্ছে। একবারও এ বিষয়ে আওয়ামী লীগ প্রতিবাদ জানায়নি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, কোনো দেশপ্রেমিক এমন স্পষ্ট অন্যায়ের প্রতিবাদ না করে কি থাকতে পারে?

আওয়ামী সাবেক পানিমন্ত্রী আবদুর রাজ্জাক কী করে এমন নির্লজ্জ বক্তব্য রাখতে পারেন যে, ভারত থেকে চুক্তিরও বেশি পানি বাংলাদেশ পাচ্ছে? অথচ উত্তরবঙ্গ পানির অভাবে মরুভূমিতে পরিণত হচ্ছে বলে জনগণ বাস্তবে দেখতে পাচ্ছে।

সমাপ্ত

www.pathagar.com

"যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তা'হলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নাই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি। বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিত ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মত আচরণ করেছেন।"

-ফিল্ড মার্শাল মানেক শ'
(ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান)
স্টেটম্যান, ২৯ এপ্রিল '৮৮

www.pathagar.com